কথায় কথায় ফ্যাসাদ

শিবরাম চক্রবর্তী

এভারেস্ট বুক হাউস
এ১২এ, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২
১৩৪৭

প্রকাশক
বি. ঘোষ
এভারেষ্ট বুক হাউস
এ১২এ, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট
কলিকাতা-১২

মুদ্রক
শ্রীধরনীকান্ত ঘোষ
নিউ লক্ষ্মীশ্রী প্রেস
১৯, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদশিল্পী
শ্রীবিমল দাস

॥ উৎসর্গ ॥

রূপশ্রী, নন্দিনী, রিক্তা,

সুপ্রিয়, সুরজিৎ, সুরঞ্জন,

সুমহান, সুনায়ক, সুভদ্র,

পথিকৃৎ আর

সুধীন্দ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়কে

कथाय कथाय फ्यासाद
शिवराम चक्रवर्त्ती
एक रुपया

পাক প্রণালীর বিপাক!

"তুমি রাঁধতে জানো দাদা?" সকলে চা খাবার সময়ে বিনি জিগ্যেস করল।

"রাঁধতে জানিনে? কী বলিস!" সগর্ব্বে আমি বলি: "এক্ষুনি একটা ডিম সেদ্ধ করে' তোকে দেখিয়ে দেব?"

"ডিম তো নিজগুণেই সেদ্ধ হয়, তার মধ্যে আবার দেখাবার কী আছে? ওটা কি একটা রান্না?"

"হংসডিম্ব আর পরমহংসরা অন্যের অনায়াসে স্বয়ংসিদ্ধ হয়ে থাকেন, মানি একথা, কিন্তু তা বলে' ষ্টোভ ধরাতে হয় না? স্পিরিট যোগাড় করতে হয় না বুঝি? তাছাড়া, আরো কতো ইত্যাদি যোগাযোগ নেই?" খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এসবের কথাও ওকে জানাতে হয়।

"তবে আর কি, তাহলে তুমি পারবে। রান্না কিছু না, তার যোগাড়যন্ত্রটাই আসল, তাই যখন তুমি পারো, তখন উনুনে কড়া চাপিয়ে একটু ঘাঁটাঘাঁটি করার যন্ত্রণা, তা আর তোমার পক্ষে এমন কি!"

"কেন, এসব কথা কেন হঠাৎ?" আমাকে সন্দিগ্ধ হতে হয়।

"মামার বড্ড অসুখ, ভাবচি একবার মামার বাড়ী যাব। এই দিন দশ বারোর জন্যই। সেবা-শুশ্রূষার হাঙ্গাম্—মামীমা পেরে উঠচেন না একলা।"

"মামাকে দেখতে যাবে? আর এধারে আমাকে কে ছাখে?"

"আয়না রইলো। নিজেই দিন কতক নিজেকে একটু দেখলে না হয়।" বিনি হাসে। "ভাড়ার ঘরে চাল ডাল নুন লঙ্কা পেঁয়াজ আটা ঘি ময়দা গুঁড়ো মশলা—চিনি বাদে—আর সবই মজুদ রইলো। কোন্‌টা কি চিনতে পারবে নিশ্চয়। তাছাড়া একখানা পাকপ্রণালীও কিনে রেখে গেলাম। ইচ্ছে মত পাকাবে, খাবে।"

"কী সর্ব্বনাশ!" পাকানোর কথায় আমি ককিয়ে উঠি।

"সর্ব্বনাশটা কি? মরুভূমিতে পড়োনি যে হাহাকার করছ। দশ বারো দিন নিজেকে নাইয়ে খাইয়ে টিকিয়ে রাখতে পারবে না? কিসের মানুষ তবে? রবিন্‌সন্‌ ক্রুসোর মতন যদি বিজন দ্বীপে একলাটি গিয়ে পড়তে হতো কী করতে?"

"কাঁদতাম, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতাম।" একটা সত্যি কথা বলে ফেলি।

অনেক বল্লাম, অনেক করে বোঝালাম, অনেক অনেক কাকুতি মিনতি করলাম, দীর্ঘ দশ বারো দিনের জন্যে একটি অসহায় অনাথ বালককে এভাবে একলা পরিত্যাগ করে চলে যাওয়া তার উচিত হচ্ছে না, হয়তো আমিও এক অসুখে পড়তে পারি—মামার চেয়েও ঢের শক্ত অসুখে,—নানাদিক থেকে নানা রকমে ওর প্রাণে সমবেদনা জাগানোর চেষ্টা করলাম, কিন্তু কোনো ফল হোলো না। বিনি চলে গেল।

লেখকদেরও পৌরুষ বলে' একটা জিনিস থাকে। টের পাওয়া না গেলেও থাকতে পারে। এবং অনেক সময়ে গিয়েও যায় না। রবিন্‌সন্ ক্রুসোর মত মহাপুরুষ না হলেও, আপাতদৃষ্টিতে তারা যতই অপদার্থ মনে হোক্, কোনো কোনো লেখকের মধ্যে, লেখা ছাড়াও অন্যান্য সদ্‌গুণের এক-আধটু ছিটে ফোঁটা থাকা সম্ভব। এই যেমন আমি। আমার নিজের মধ্যে পৌরুষের কোনো সম্ভাবনা কখনই আমি সন্দেহ করিনি, কিন্তু দেখলাম আছে। দেখা গেল, মরিয়া হয়ে উঠলে রাঁধতেও পারি। আমি রাঁধতামও, শেষ পর্য্যন্ত ; যদি না মাঝখানে ঐ আছাড়টা আমাকে খেতে হোতো।

বিনির অন্তর্দ্ধানের পরদিন সকালে বিছানা থেকে উঠেই চমৎকার করে' এক কাপ চা বানিয়েছি। একজোড়া ডিম সেদ্ধ করতেও দ্বিধা করিনি। অবশেষে সডিম্ব সেই চায়ের পাত্র বিছানায় নিয়ে এসে আরাম করে' খেয়ে আবার এক ঘুম লাগিয়েছি। হজম করতে হলে ঘুমোনো দরকার। উত্তমরূপে পরিপাকের জন্য উত্তমরূপ নিদ্রার প্রয়োজন। আর আমার মতে, ঘুমোনোর জন্যেই আমাদের খাওয়া। খালিপেটে থাকলে খিদে পায়, আর খিদে পেলে ঘুম পায়না বলেই নেহাৎ কষ্ট করে' আমাদের দুবেলা কি তিনবেলা কিম্বা চারবেলা খেতে হয়। তাই না ?

তারপর এগারোটার পর ঘুম থেকে উঠে পাকপ্রণালীটা হাতে করেছি। ষ্টোভটা পায়ের কাছেই রয়েছে—ধরাতে যা দেরি।

পাকপ্রণালীটার পাতা ওল্‌টাচ্ছি, আজ আর বেশি কিছু না, বিশেষ কিছু নয়, সবচেয়ে সোজা রান্না একখানা রেঁধে সোজা-সুজি খেয়ে সহজভাবে শুয়ে পড়ব। তারপর ওবেলা রেস্তরাঁ দেখলেই হবে। তারপর—কালকের কথা আবার কাল। এই ক'রে এই দশ বারোটা দিন তো তুড়ি দিয়ে উড়িয়ে দিতে পারব। বিনিকে আমি দেখিয়ে দিতে চাই। চাই কি, নিজেকেও একহাত দেখাতে পারি—চটেমটে হয়তে পোলাও কালিয়াও রেঁধে ফেলতে পারি —এর মধ্যেই একদিন—কিছু আশ্চর্য্য নয়।

'পেঁয়াজের সুপ, রান্নার সহজ প্রণালী'টাই সবচেয়ে আমার লাগসই লাগল। পেঁয়াজের সুপ সাহেবি রেঁস্তারায় বহুৎ খেয়েছি —চমৎকার লাগে। তাই না হয় বানিয়ে খাওয়া যাক আজকে। খেতেও ভালো, রাঁধতেও শক্ত না—যেমন পুষ্টিকর তেমনি উপাদেয়।

বইটায় দেখলাম, পেঁয়াজের সুপকে নামমাত্র খরচায় অল্প পরিশ্রমে প্রস্তুত বিলাসিতার চূড়ান্ত বলে বর্ণনা করা হয়েছে। আমি বিলাসিতার পক্ষপাতী নই, তবু বাধ্য হয়ে আজ একটু বিলাসিতাই করতে হবে, কি করা যাবে? আর এই বিলাসিতা সমস্তটা একলাই উপভোগ করতে হবে আমায়, উপায় নেই। আমার রান্নার সৌরভ যে কতদূর যাবে জানিনে, তবু কোনো বন্ধু যে গন্ধ পেয়ে আমার পেঁয়াজের ঝোলে ভাগ বসাতে আসবেন তা মনে হয় না। সমস্ত সুরুয়াটা এক এক চুমুকে চেখে চেখে আর তারিয়ে তারিয়ে—একটু তাড়াতাড়ি না করে'—সুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত—

সুরুৎ সুরুৎ আওয়াজে একাই আমি আত্মসাৎ করতে পাবো। কেউ বাগড়া দেবার বখরা নেবার নেই। আ—হ্।

পাকপ্রণালীর নিয়মাবলী অনুসরণে লাগা গেল। ষ্টোভ্টা ধরিয়েছি এবং বিছানা থেকে বেশ দূরে সরিয়ে এনেছি—পাছে বিছানাটিছানা ওর অনুকরণে ধরে যায়। আগুনরা ভারী সংক্রামক। সাবধানতা ভালো।

"প্যানে আন্দাজমতো জল দাও"––বলেছে পাকপ্রণালী।

আন্দাজমতো জল দিলাম—যতদূর আন্দাজ করতে পারা গেল।

"জল ফুটতে থাকুক।" থাকুক আমার কোন আপত্তি নেই।

"আধসেরটাক্ পেঁয়াজ কুঁচিয়ে ফ্যালো। একেবারে কুচি কুচি করে'।"

তথাস্তু। কিন্তু এইটেই এর মধ্যে সবচেয়ে শ্রমসাপেক্ষ দেখা যাচ্ছে। এবং একটু বিপজ্জনকও বই কি। পেঁয়াজের সঙ্গে নিজের কড়ে আঙুলটাও প্রায় কুঁচিয়ে ফেলেছিলাম একটু হলে! আর পেঁয়াজ কুঁচাতে বসলে, কেন জানিনা, ভারী কান্না পায়। আজই প্রথম এটা দেখতে পাচ্ছি—এমনকি, চোখের জলে ভালো দেখতেই পাচ্ছিনে। কোথ্থেকে চোখে এত জল আসে আর এমন চোখ জ্বালা করে! যাঁরা মারা গেছেন, মারা, দিদিমারা দিদিমার মা আর মার দিদিমারা সব একে একে স্মরণ পথে আসতে থাকেন। ভারী কান্না পায়, আরো চোখ জ্বলে, এবং আরো কান্না হাউ হাউ করে' ঠেলে আসে সেই শোকের উজান ঠেলে অবশেষে দিদিমার দিদিমারা পর্য্যন্ত ভেসে আসেন। কান্না আর থামে

না। গাল বেয়ে, গলা জড়িয়ে দরবিগলিত ধারে বুক ভাসিয়ে দেয়। কান্নার আবেগে আরো কাঁদি। অকারণে কাঁদি। অশ্রুপ্লুত হয়ে পেঁয়াজ কুচি করি।

হাপুস্ হয়ে কেঁদে নেয়ে পেঁয়াজ কুঁচিয়ে উঠি। উঠে চোখ মুছে প্যানের ফুটন্ত জলে সেই কুঁচানো পেঁয়াজদের জলাঞ্জলি দিই। দিয়ে আবার চোখ মুছি। এমন কি, ওই পেঁয়াজদের দশা ভেবে—ওদের জন্যও চোখে জল আসে আবার। কাঁদতে কাঁদতে বইয়ের পাতা ওল্টাই।

"এইবার কয়েকটা গোল আলু ওর মধ্যে ছুঁড়ে দাও। গোল আলুগুলো খোসা-ছাড়ানো হওয়া দরকার।"—বইয়ে বাংলায়।

সারা ভাঁড়ার ঘর আঁতি পাঁতি করে' খুঁজি, কিন্তু খোসা ছাড়ানো গোল আলু একটাও আমার চোখে পড়ে না। প্রত্যেক আলুর গায়েই খোসা লাগানো। অথচ বইয়ে লিখেছে, খোসা ছাড়ানো আলুই চাই। তা না হলে—অন্য আলু দিয়ে হবে না। কি মুস্কিল ছাখো দিখি ? কী যে করি এখন!

সুশীলাদির বাড়ী ছুটতে হয়। সুশীলাদি আমার রান্না বান্নায় ওস্তাদ। আলুপটলদের নাড়ীনক্ষত্র ওঁর নখাগ্রে—ওদের স্বভাব চরিত্রের সব রহস্য ওঁর জানা।

"দিদি, আমাকে গোটাকতক খোসা ছাড়ানো আলু দিতে পারো ভারী দরকার। অথচ বাজারে কি কোথ্থাও পাওয়া যাচ্ছে না।"

বলতেই সুশীলাদি হাস্তে হাস্তে তাঁর রান্নাঘর থেকে ঐ আলু আধ ডজন আমার হাতে তুলে ছ্যান্। আমিও আর দ্বিরুক্তি না করে

দৌড়াতে দৌড়াতে ফিরে আসি। এসে দেখি সারা প্যান্ দিব্যি আনন্দে টগ বগ করছে! গন্ধ ভুর্ ভুর্।

"এবার আলুগুলো ওর ভেতরে ছুঁড়ে দাও।"

ছুঁড়ে দেবার চেষ্টা করি—কিন্তু একটার পর একটা, চারটেই তাক ফস্কে গেল দেখে—বাকী দুটোকে আর ছুঁড়ে না দিয়ে, এগিয়ে গিয়ে প্যানের ভেতরে ছেড়ে দিই। পাকপ্রণালীর উপদেশের অন্যথা করা হলো, অন্যায় হলো বুঝলাম। কিন্তু কি করব, পাকা রাঁধুনির মত হাতের তাক্ যদি আমার না থাকে (থাকা স্বাভাবিকও নয়,) তাহলে কি করা যায়? সবাই কি দূর থেকে তাক্ মাফিক ছুঁড়তে পারে?

"এইবার অল্প করে' গোলমরিচের গুঁড়ো ছিটিয়ে দাও।"

অল্প করে গোলমরিচের গুড়ো কখনও ছিটিয়েচ? ছিটিয়ে দেখেচ কী হয়? রান্নার কী হয় তা বলচিনে, রাঁধুনির কী হয়, তাই আমার বক্তব্য। এক কথায়—হাঁচি হয়, দুর্দ্দান্ত রকমের হাঁচি। মশলার কৌটো ছিটকে যায়—কেথায় যায় জানা যায় না—খুনতি উড়তে থাকে—আত্মসম্বরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে।

হাঁচির হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে কোনোরকমে সামলে প্রায় তিনশো হাঁচি হাঁচার পর চোখ খুল্তে পেরেচি—চেয়ে দেখি, পেঁয়াজের কারি প্যানের গলা ছাড়িয়ে উঠচে। আধ প্যানের বেশি জল দিইনি, অথচ তাই যে এতক্ষণ ফুটেও কি করে' এক প্যান্ হয়ে উঠল—প্যান্টা নেহাৎ ছোট ছিল নাতো—তাই দেখে আমার তাক্ লাগে। আর সেই কারির টগবগানি কি! কী তার লম্ফ

ঝক্ষ! বইয়ের কথা তো অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি, তবু কোথায় যে কী গলদ ঘটল আমি বুঝি না।

দেখতে দেখতে সেই স্থপ প্যান্ ছাপিয়ে ষ্টোভ ছেয়ে গেল। ষ্টোভ ছেয়ে উপচে পড়তে লাগল। আর অত উপচেও প্যান্‌ভর্ত্তি কারির কিছু কমতি দেখা গেল না। আশ্চর্য্য কারি-কুরি! এবং এর ওপরে ফোঁস্ ফোঁসানিও তার যেন বেড়ে গেল আরো! আরো বেশি লাফাতে স্থুরু করে দিল আবার। আমাকে দেখেই কিনা কে জানে।

অবশেষে সেই স্থপ—আগ্নেয়গিরির লাভাপ্রবাহের মত—ছড়িয়ে পড়তে পাগল ইতস্ততঃ। স্ততঃর মধ্যে আমাকে ধরা যেতে পারে। তীরবেগে ছুটে এসে আমার পায়ে ছাঁৎ করে' লাগতেই আমি এক লাফ মেরেছি। আর তার পরেই পিছন ফিরে দে-ছুট্।

কিন্তু ছুট্ দিলে কি হবে, 'একশ গজের দৌড়ে' কোনোদিনই আমি পুরস্কার পাইনি। স্থপের সঙ্গে দৌড়েও আজ হেরে গেলাম। স্থপ আমার আগে আগে যাচ্ছিল—তার গায়ে পা লেগে পেল্লায় এক আছাড় খেয়েছি। আর সেই এক আছাড়েই বিছানায় এসে আমি ধরাশায়ী। আমার ঘরের ওধার থেকে এধার পর্য্যন্ত—পেঁয়াজের কারি থই থই করছে—কোথাও পা ফেলার যো নেই—কিন্তু ভয় নেই আর—আমি এখন বিছানার ওপরে—যতই লাফাক্, য়্যাতোদূর ওরা লাফিয়ে উঠতে পারবে না নিশ্চয়।

স্থপের থেকে ভীত নেত্র সরিয়ে বইয়ের পাতায় রাখতেই চোখে পড়ল, সব শেষে লেখা আছে, "এইবার বারো জনের উপযুক্ত চমৎকার পেঁয়াজের স্থপ বানানো হোলো।"

এক বেতার ঘটিত দুর্ঘটনা

অ্যাম্বুলেন্স চাপা পড়ার মত বরাত বুঝি আর হয় না। মোটর চাপা পড়া গেল অথচ অ্যাম্বুলেন্স আসার জন্য তর্ সইতে হোলো না—যাতে চাপা পড়লাম তাতেই চেপে হাসপাতালে চলে গেলাম। এর চেয়ে মজা কি আছে ?

ভাগ্যের যোগাযোগ বুঝি একেই বলে। অবিশ্যি, ক্বচিৎ এরূপ ঘটে থাকে—সকলের বরাত তো আর সমান হয় না। অবিশ্যি এর চেয়েও—অ্যাম্বুলেন্স চাপা পড়ার চেয়েও, আরো বড়ো সৌভাগ্য জীবনে আছে। তা হচ্ছে রেডিয়োয় গল্প পড়তে পাওয়া।

দুর্ভাগ্যের মত সৌভাগ্যরাও কখনো একলা আসে না। যখন আসে, এপিডেমিকের মতই আসে। রেডিয়োর গল্প আর অ্যাম্বুলেন্স চাপা—দুটো পড়াই একযোগে আমার জীবনে এসেছিল। সেই কাহিনীই বলছি।

কোন্ পুণ্যবলে রেডিয়োয় গল্পপাঠের ভাগ্যলাভ হয় আমি জানিনে, পারৎপক্ষে তেমন কোনো পুণ্য আমি করিনি। অন্ততঃ আমার সজ্ঞানে তো নয়, তবু হঠাৎ রেডিও অফিসের এক আমন্ত্রণ পেয়ে চমকাতে হলো। আমন্ত্রণ এবং চুক্তিপত্র একসঙ্গে গাঁথা-দক্ষিণা পর্যন্ত বাঁধা—শুধু আমার সই করে স্বীকার করে নেওয়ার অপেক্ষা কেবল। এমন কি রেডিয়োর কর্ত্তারা আমার পঠীতব্য গল্পের নামটা পর্য্যন্ত ঠিক করে দিয়েছেন। "সর্ব্বমস্তত্যম !" এই

নাম দিয়ে, এই শিরোনামার সঙ্গে খাপ খাইয়ে গল্পটা আমায় লিখতে হবে।

ত, আমার মত একজন লিখিয়ের পক্ষে এ আর এমন শক্ত কি? আগে গল্প লিখে পরে নাম বসাই, এ না হয়, আগেই নাম ফেঁদে তারপরে গল্পটা লিখ্‌লাম। ছেলে আগে না ছেলের নাম আগে, ঘোড়া আগে না ঘোড়ার লাগাম আগে, কারো কারো কাছে সেটা সমস্যারূপে দেখা দিলেও একজন লেখকের কাছে সেটা কোনো প্রশ্নই নয়। লাগামটাই যদি আগে পাওয়া গেল, তার সঙ্গে ধরে বেঁধে একটা ঘোড়াকে বাগিয়ে আনতে আর কতক্ষণ?

প্রথমেই মনে হোলো, সব আগে সৌভাগ্যের কথাটা শত্রু মিত্রনির্ব্বিশেষে সবাইকে জানিয়ে ঈর্ষান্বিত করাটা দরকার। বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়। বন্ধু বান্ধব, চেনা আধচেনা, চিনি-চিনি সন্দেহজনক যাকেই পথে পেলাম, পাক্‌ড়ে দাঁড় করিয়ে এটা-সেটা একথা সেকথার পর এই রোমাঞ্চকর কথাটা জানিয়ে দিতে দ্বিধা করলাম না। অবশেষে পই পই করে' বলে দিলাম—"শুনো কিন্তু! এই শুক্রবারের পরের শুক্রবার—সাড়ে পাঁচটায়—শুনে বলবে আমায় কেমন হোলো।"

"শুন্‌ব বইকি! তুমি গল্প বলবে আমরা শুনবো না, তাও কি হয়? রেডিয়ো কেনা তবে আর কেন? তবে কি না, রেডিয়োটা কদিন থেকে আমাদের বিকল হয়ে রয়েছে—কে বিগ্‌ড়ে দিয়েছে বোঝা যাচ্ছে না ঠিক। গিন্নির সন্দেহ অবশ্যি আমাকেই—যাক্‌,

এর মধ্যে ওটা সারিয়ে ফেলব'খন। তুমি গল্প পড়ছ, সেটা শুনতে হবে তো।" একজনের আপ্যায়িত-করা জবাব পেলাম।

আরেকজন তো আমার কথা বিশ্বাসই করতে পারেন নাঃ "বলো কি? আরে, শেষটায় তুমিও! তোমাকেও ওরা গল্প পড়তে দিলে? দিনকে দিন কী হচ্ছে কোম্পানীর! আর কিছু বোধ হয় পাচ্ছে না ওরা—নইলে শেষে কিনা তোমাকেও—ছিঃ ছিঃ ছিঃ!—অধঃপাতের আর বাকী কি রইলো হে? নাঃ, এইবার দেখবে অল ইণ্ডিয়া রেডিয়ো উঠে যাবে, আর বিলম্ব নেই!"

বন্ধুবরের মন্তব্য শুনে বেশ দমে গেলাম—তথাপি আমতা আমতা করে বল্লাম—"রেডিয়োর আর দোষ কি দাদা? খোদার দান। খোদা যখন ছ্যান্ ছাপ্পর ফুঁড়ে দিয়ে থাকেন, জানো তো? এটাও তেমনি আকাশ ফুঁড়ে পাওয়া—হঠাৎ এই আকাশবাণীলাভ।"

"আচ্ছা 'শুন্‌ব'খন। তুমি যখন এত করে' বলছ। অ্যাসপিরিন স্মেলিং সল্‌ট—এসব হাতের কাছে রেখেই শুন্‌তে হবে। তোমার গল্প পড়লে তো—সত্যি বলছি, কিছু মনে কোরোনা—আমার মাথা ধরে যায়—শুনলে কী ফল হবে কে জানে।" মুখ বিকৃত করে' বন্ধুটি জানিয়ে গেলেন।

তবু আমি নাছোড়বান্দা। পথে ঘাটে যাঁদের পাওয়া গেল না তাদের বাড়ী ধাওয়া করে' সুখবরটা দিলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, উক্ত শুক্রবারে সেই মূহূর্ত্তে সকলেই শশব্যস্ত! কারো ছেলের বিয়ে, কারো মেয়ের পাকা দেখা, কার আবার কিসের যেন এন্‌গেজমেণ্ট,

কাউকে খুব জরুরি দরকারে কলকাতার বাইরে যেতে হচ্ছে ? এমনি কত কি কাণ্ডে সেই দণ্ডে সবাই বিজড়িত—রেডিয়োর কর্ণপাত করার কারো ফুরসৎ নেই। কী মুস্কিল, ছ্যাখো দেখি। আমি গল্প বলব কেউ শুনবে না। আমার জানাশোনারা শুনতে পাবে না—এর চেয়ে দুঃখ আর কী আছে ? আমার গল্পপড়ার দিনটিতেই যে সবার এত গোলমাল আর জরুরি কাজ এসে জুটবে তা কে জানত ?

আর তাছাড়া, রেডিয়োর সময়টাতেই তারা কেন যে এত ভেজাল জোটায় আমি তো ভেবে পাই না। পূর্বজন্মের তপস্যার পুণ্যফলে রেডিয়োকে যদি ঘরে আনতে পেরেছিস্—তাই নিয়েই দিনরাত মশ্‌গুল্ থাক—তা না।—অন্ততঃ প্রোগ্রামের ঘণ্টায় যে কক্ষনো কক্ষচ্যুত হতে নেই একথাও কি তোদের বলে দিতে হবে ? আর সব তালে ঠিক আছিস কেবল রেডিয়োর ব্যাপারেই তোরা আন্‌রেডি—সব তোদের উল্টোপাল্টা !

সত্যি, আমার ভারি রাগ হতে লাগল। অবশ্যি, ওদের কেউই আমাকে আশ্বাস দিতে কসুর করল না যে যত ঝামেলাই থাক যেমন করে' হোক, আমার গল্পটার সময়ে অন্ততঃ ওরা কান খাড়া রাখবে—যত কাজই থাকনা, এটাও তো একটা কাজের মধ্যে। বন্ধুর প্রতি কর্ত্তব্য তো। এমন কি কলকাতার বহির্গামী সেই বান্ধবটিও ভরসা দিয়ে গেলেন যে ট্রেন ফেল করার আগের মিনিট পর্য্যন্ত কোনো চুল-ছাঁটা সেলুনের সামনে দাঁড়িয়ে যতটা পারা যায় আমার গল্পটা শুনে তবেই তিনি রওনা দেবেন।

সবাইকে ফলাও করে' জানিয়ে ফিরে এসে গল্পটা ফলাতে লাগা গেল। "সর্ব্বমত্যন্তম্—এর সঙ্গে যুতমতো, মজবুৎমতো একটা কাহিনীকে জুড়ে দেয়াই এখন কাজ।"

কিন্তু ক্রমশঃ দেখা গেল কাজটা মোটেই সহজ কাজ নয়। গল্প তো কতই লিখেছি, কিন্তু এধরণের গল্প কখনো লিখিনি। ছোট্ট একটুখানি বীজ থেকে বড় বড় মহীরূহ গজিয়ে ওঠে, লোক বলে থাকে, আমি নিজের চোখে কখনো দেখিনি বটে, তবে লোকের কথায় অবিশ্বাস করতে চাইনে। তবুও, একথা আমি বলব যে গাছের বেলা তা হয়ত সত্যি হলেও একটুখানি বীজের থেকে একটা গল্পকে টেনে বার করে' আনা দারুণ দুঃসাধ্য ব্যাপার!

বলব কি ভাই, যতই প্লট ফাঁদি আর যত গল্পই বাঁধি, আর যত রকম করেই ছকতে যাই, কিছুতেই ওই "সর্ব্বমত্যন্তম্"-এর সঙ্গে খাপ্ খাওয়ানো যায় না। একটা গল্প লিখতে গিয়ে ভাবতে ভাবতে একশটা গল্প এসে গেল, মনের মধ্যে গল্পের একশা, আর মনের মত তার প্রত্যেকটাই, কিন্তু নামের মত একটাও না।

ভাবতে ভাবতে সাত রাত্রি ঘুম নেই, এমন কি, দিনেও দু চোখে ঘুম আসে না। চোখের কোলে কালি পড়ে গেল আর মাথার চুল সাদা হতে সুরু করল। অর্দ্ধেক চুল টেনে টেনে ছিঁড়ে ফেল্লাম—আর কামড়ে কামড়ে ফাউন্টেনের আধখানা পেটে চলে গেল। কত গল্পই এই ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে এল আর গেল কিন্তু কোনটাই ওই নামের সঙ্গে খাটল না।

তখন আমি নিজেই খাটলাম—আমাকেই খাটিয়া নিতে হোলো শেষটায়।

শুয়ে শুয়ে আমার খাতার শুভ্র অঙ্কে—আমার অনাগত গল্পের আষ্টে-পৃষ্ঠে-ললাটে কত কী যে আঁকলাম! কাগের সঙ্গে বগ জুড়ে দিয়ে, বাঘের সাথে কুমীরের কোলাকুলি বাধিয়ে, হনুমানের সঙ্গে জাম্বুবানকে জর্জ্জরিত করে, সে এক বিচ্ছিরি ব্যাপার!

সব জড়িয়ে এক ইলাহী কাণ্ড! কী যে ওই সব ছবি—তার কিচ্ছু বুঝবার যো নেই, অথচ বুঝতে গেলে অনেক কিছুই বোঝা যায়। গুহা মানুষেরা একদা যে সব ছবি আঁকতো, এবং মানুষের মনের গুহায়, মনশ্চক্ষুর অগোচরে এখনো যে সব ছবি অনুক্ষণ অঙ্কিত হচ্ছে, সেই সব অন্তরের অন্তরালের ব্যাপার! মানুষ পাগল হয়ে গেলে যে সব ছবি আঁকে অথবা যে সব ছবি আঁকবার পরেই পাগল হয়ে যায়। সর্ব্বমত্যন্তম্—ড্যাশ—উইদিন্ ইন্ভার্টেড কমার শিরোনামার ঠিক নীচে থেকে সুরু করে' গল্পের শেষ পৃষ্ঠায় আমার নাম-স্বাক্ষরের ওপর অবধি কেবল ওই সব ছবি—ওই পাগলকরা ছবি সব! পাতার দুধারে মার্জ্জিনেও তার বাদ নেই—মার্জ্জনা নেই কোনোখানে।

তোমরা হাস্‌ছো? তা হাসতে পারো। কিন্তু ছবিগুলো মোটেই হাসবার মতো নয়—দেখ্‌লেই টের পেতে। ওই সব ছবির গর্ভে যে নিদারুণ আর্ট নিহিত রইলো, আমার আশা, সমঝ্‌দারের সাহায্যে (রাঁচির বাইরেও তাঁরা থাকবেন নিশ্চয়)। একদিন তার তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হবে—হবেই—চিরদিন কিছু তা

ছলনা করে' নিগূঢ় হয়ে থাকবে না। আমার গল্পের জন্য, এমনকি আমার কোনো লেখার জন্য কখনো কোনো প্রশংসা না পেলেও; ওই সব ছবির খাতিরে খ্যাতি আমার আছেই—ওদের জন্য একদিন না একদিন বাহবা আমি পাবই। ওরাই আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে—আজকে না হলে আগামীকালে—মানুষের দুঃস্বপ্নের মধ্যে অন্ততঃ—এ বিশ্বাস আমার অটল।

অবশেষে সর্ব্বমত্যন্তম্-এর পরে ড্যাশের জায়গায় শুধু গর্হিতম্—কথাটি বসিয়ে রচনা শেষ করে আমার গল্পের সেই চিত্ররূপ নিয়ে নির্দ্দিষ্ট দিনক্ষণে রেডিয়ো ষ্টেশনের দিকে দৌড়ালাম।

ভেবে দেখলে সমস্ত ব্যাপারটাই গর্হিত ছাড়া কি? আগাগোড়া ভালো করে ভেবে দেখা যায় যদি আমার পক্ষে রেডিয়োয় গল্প পড়তে পাওয়া এবং যে দক্ষিণায় গল্প বেচে থাকি সেই গল্প পড়তে গিয়ে তার তিনগুণ দাক্ষিণ্যলাভের সুযোগ পাওয়া দস্তুরমত গর্হিত বলেই আমার মনে হতে থাকে। এবং যে গল্প আমি চিত্রাকারে মিকি মাউসের সৃষ্টি কর্ত্তাকে লজ্জা দিয়ে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা ধরে ফেঁদেছি তার দিকে তাকালে—না, না এর সমস্তটাই অত্যন্তম্—অতিশয় অত্যন্তম—এবং কেবল অত্যন্তম্ নয় অত্যন্তম্ গর্হিতম্।

তারপর? তারপর সেই গল্প নিয়ে হন্যে হয়ে যাবার মুখে আমার দুনম্বর বরাত এসে দেখা দিল। আমি অ্যাম্বুলেন্স চাপা পড়লাম।

হাসপাতালে গিয়েও, হাত পা ব্যয় না করে নিজে বাজে খরচ

না হয়ে অটুট অবস্থায় বেরিয়ে আসাটা তিন নম্বর বরাত বলতে হয়। কিন্তু সশরীরে সর্ব্বাঙ্গীণরূপে লোকালয়ে ফিরে এসে ভাগ্যের ত্র্যহস্পর্শের কথাটা যে ঘটা করে যাকে তাকে বলবো, বলে একটু আরাম পাবো তার যো কি! যার দেখা পাই যাকেই বলতে যাই কথাটা, আমার সূত্রপাতের আগেই সে মুক্তকণ্ঠ হয়ে ওঠে।

'চমৎকার! খাসা! কী গল্পই না পড়লে সেদিন! যেমন লেখায় তেম্‌নি পড়ায়—লেখাপড়ার যে তুমি এমন ওস্তাদ্ তার পরিচয় তো ইস্কুলে কোনোদিন দাওনি হে! সব্যসাচি যদি কাউকে বলতে হয় তো সে তোমায়! আমাদের সবাইকে অবাক্ করে দিয়েছ মাইরি!'

আমিও কম অবাক্ হইনে। প্রতিবাদ করতে যাব কিন্তু হাঁ করবার আগেই আরেকজন হাঁ হাঁ করে এসে পড়েছেন।

'তোমার গল্প অনেক পড়েছি! ঠিক পড়িনি বটে তবে শুন্‌তে হয়েছে। বাড়ীর ছেলেমেয়েরাই গায়ে পড়ে শুনিয়ে দিয়েছে। শোনাতে তারা ছাড়েনা—তা সে শোনাও পড়ার মতই! কিন্তু যা পড়া সেদিন তুমি পড়লে তার কাছে সে সব কিছু লাগে না। আমার ছেলে মেয়েদের পড়াও না। হ্যাঁ সে পড়া বটে একখান্। আহা এখনো যেন এই কানে—এইখানে লেগে রয়েছে হে!'

তাঁর মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে বল্লেন আরেকজন—'গল্প শুনে তো হেসে আর বাঁচিনে ভায়া! আশ্চর্য্য গল্পই পড়লে বটে! বাড়ী শুদ্ধ, সবাই—আমার দুধের ছেলেটা পর্য্যন্ত উৎকর্ণ হয়েছিল, কখন্

তুমি গল্প পড়বে। আর যখন তুমি আরম্ভ করলে সেই শুক্রবার না কোন্‌বারে—বিকেলের দিকেই না ?—আমরা তো শুনবামাত্র ধরতে পেরেছি—এমন টক-মিষ্টি—ঝাল্‌-ঝাল্‌—নোন্‌তা গলা আর কার হবে ? আমার কোলের মেয়েটা পর্য্যন্ত ধরতে পেরেছে যে আমাদের রামদার গলা !'

রামদা-টা গলা থেকে তুল্‌তে না তুল্‌তেই অপর এক ব্যক্তির কাছে শুন্‌তে হোলো—'বাহাদুর, বাহাদুর। তুমি বাহাদুর! রেডিয়োয় গল্প পড়ার চান্‌স্‌ পাওয়া সহজ নয়, কোন্‌ ফিকিরে কি করে' জোগাড় করলে তুমিই জানো। তারপরে সেই গল্প মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে ওগ্‌রানো—সে কি চাট্টিখানি ? আমার তো ভাবতেই পা কাঁপে, মাথা ঘুরতে থাকে। কি করে পারলে বলোতো ? আর পারা বলে পারা—অমন নিখুঁৎ ভাবে পারা —যা একমাত্র কেবল হাঁসেরাই পারে। আবার বলি, তুমি বাহাদুর !!'

তারাই আমায় তাক্‌ লাগিয়ে দিল। রেডিয়োর স্বর্গে যাবার পথে উপসর্গে আটকে অ্যাম্বুলেন্স চেপে আধুনিক পাতালে যাওয়ার অমন গালভরা খবরটা ফাঁস করার আর ফাঁক পেলাম না।

পরিত্যক্ত জলসা

'হরিনাথবাবু ক্ষেপেছেন আবার!' ফিসফিসিয়ে বল্লেন, সেকেন্ পণ্ডিত।

হরিনাথবাবু আমাদের স্কুলের হেড্ মাষ্টার—এবং হেড মাষ্টারের পক্ষে কতদূর ভালো হওয়া সম্ভব তিনি তার অত্যুজ্জ্বল উদাহরণ। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় তিনি ছেলেদের শাসন করতে জানেন না। অবিশ্যি আর, যারই হোক্, এটা আমাদের—ছেলেদের দুঃখের বিষয় নয়। তবে ছাত্রদের তাড়না করবার প্রেরণা নেই বলে' আর সব মাষ্টাররা আপ্সোস্ করেন। আপ্সোস্ করেন আর নিস্পিস্ করতে থাকেন, এমন কি, এ—স্কুলে মাষ্টারি করে' আর কী লাভ, এমন কথাও সময়ে-অসময়ে তাঁদের মুখ ফস্কে শোনা যায়।

এবার, কলকাতার শিক্ষক-সম্মেলনের ফের্তা হরিনাথবাবু নতুন এক আইডিয়া মাথায় করে' এসেছেন। তাঁর মতে, আইডিয়া; অন্যান্য মাষ্টারের মতে—তাঁর আরেক খেয়াল। তাঁর ধারণায়, আমাদের জীবনে আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা না থাকায় সব উৎসাহ জুড়িয়ে জল হয়ে যাচ্ছে! এই জন্যে মাঝে মাঝে এক আধটা জলসা হওয়ার দরকার।

সেকেন পণ্ডিত বলেছেন—"এটায় তাঁর সেই ব্যাট্‌বল্ খেলার মত হবে।"

হ্যাঁ এর আগের বারে তিনি ক্রিকেটের আইডিয়া নিয়ে ফিরেছিলেন। ঠিক মাথায় করে নয়, কিম্বা মাথায় করে, বল্লেই বোধ হয় ঠিক হয়। এক রাজ্যের উইকেট, বল, ব্যাট্, পায়ে-পরা প্যাড ইত্যাদির বোঝা নিয়ে যখন তিনি ফিরলেন তখন বলতে কি, আমাদের বেশ উৎসাহই হয়েছিল। কিন্তু পরে যখন দেখা গেল বলগুলো এক মণ করে ভারী, ছুড়তে হাত ব্যাথা হয়ে যায় আর তিন দিন ধরে সেই ব্যাথা যথাস্থানে জমে থাকে আর এধারে যতই কায়দা করে ছোড়াছুড়ি করো না কেন উইকেটের এক মাইলের মধ্যে দিয়ে কিছুতেই তারা যাবার পাত্র না, তখন আমাদের সব উৎসাহ জল হয়ে গেল! তার ওপরে আবার ব্যাটের দুর্ব্ব্যবহার আছে, একজন ব্যাট্‌কীপার—ব্যাট্‌কীপার ছাড়া আর কীই বা বলা যায়?—কখনো ব্যাট্ দিয়ে তো ওকে একখানা বলের প্রতিও বল-প্রয়োগ করতে দেখা যায় না —হ্যাঁ একদিন একজন ব্যাট্‌কীপার্ করল কি একটা আগন্তুক বল্‌কে হাঁকড়াতে না গিয়ে—বল্ তার দেড় মাইল দূর দিয়ে যাচ্ছিল—নিজের মাথায় ব্যাট্ মেরে বস্‌ল। নিজের কপালে ব্যাটাঘাতেও তেমন কিছু ক্ষতি ছিল না সে কর্‌ল কি ঘুরতির মুখে সেই ব্যাট্ দিয়েই উইকেট্‌কীপারের এক পাশের এক গাদা দাঁত খসিয়ে দিলে। আমরা খুব চটে গেলাম। চটবই তো, আমাদের সন্দেহ হোলো হেড্‌মাষ্টার মশাই হাতে না মেরে এই ভাবে ব্যাট্‌বলের সাহায্যে আমাদের দুরস্ত করছেন! দাঁতে মারছেন আমাদের। উইকেট আর ব্যাটকীপার দুজন সেই ধাক্কায়

সেই যে শয্যা নিল আর তারা উঠল না। ক্রিস্‌মাসের ছুটি পর্য্যন্ত তারা পাল্লা দিয়ে বিছানায় শুয়ে কাটিয়ে দিল। তারপর তারা সেই ক্রিকেটের দৌলতেই ক্লাস্‌ প্রমোশন আদায় করে (আফটার্‌অল্‌ ইট ওয়াজ নট ক্রিকেট !)—রুগ্ন শয্যা পরিত্যাগ করে লাফাতে লাফাতে বাড়ী চলে গেল। ফিরে এল ছুটি খতম্‌ করে, নতুন বছরে—এসেই তারা ফের ক্রিকেট খেলার আগ্রহ প্রকাশ করেছিল, কিন্তু ক্রিকেট তখন কোথায় ? আমরা ব্যাট, বল্‌ পায়ে বাঁধা প্যাডের বালিশ সবশুদ্ধ—(মাথায় যখন বল্‌রা ব্যাটরা এসে লাগে তখন নাহক্‌ পায়ে বালিশ জড়িয়ে ফল ?—হতে হলে আপাদমস্তক বালিশ-বন্দী হতে হয়)—সর্ব্বসমেত পদ্মার গর্ভে জলাঞ্জলি দিয়ে এসেচি। বস্তুতপক্ষে ক্রিকেটকে তারা দুজন ছাড়া আমরা কেউই যখন ঠিকমত ব্যবহার করতে পারলুম না—ক্রিকেট নিজগুণে আপনা থেকেও আমাদের কারো কাজে যখন লাগল না—আর কোনো কারুকার্য্যই হোলো না যখন ওকে দিয়ে—তখন আর অনর্থক গায়ের ব্যাথা বাড়িয়ে লাভ ?

"ভদ্রমহোদয়গণ আমার কি মনে হয় জানেন।" হেডমাষ্টার মশাই অন্যান্য মাষ্টারদের ডেকে জানালেন—"এই রকম প্রায়শঃ জল্‌সা প্রভৃতির দ্বারা কেবল যে ছেলেদের জীবনে উদ্দীপনা বাড়ানো হবে তাই নয় এতে করে পারস্পরিক ভাবের আদান-প্রদানের ফলে শিক্ষক ও ছাত্রের সম্বন্ধ আরো মধুরতর হয়ে উঠবে তাদের সদ্ভাবও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাবে।"

এই ছোট বক্তৃতাটি দেবার পরই তিনি আমাদের ডাক্‌ করে

একটা প্রশ্ন ছুঁড়লেন—“এখন তোমরা কে কি করতে পারো বলো দেখি ?”

আমরা এতক্ষণ ধরে’ একজোট হয়ে তাঁর বক্তব্য থেকে জল্সার ব্যাপারটা কী জেনে নেবার চেষ্টা কর্‌ছিলাম—জলসা হলেও জলের সঙ্গে তার কোন মিল নেই, এমন কি, জলযোগের সঙ্গেও সম্পর্ক নেই কোনো—না-যাত্রা না-থিয়েটার না-ভোজবাজি—অথচ সব কিছুর গর্‌মিল্ এই বিষয়টা ধীরে ধীরে আমাদের কাছে প্রাঞ্জল হয়ে আসছিল তখন।

“আমি গান গাইতে পারি।” সাহস করে, আমি বল্লাম।

“আমরাও সেই ভয় করেছি।” বল্লেন হরিনাথবাবু। তুমিই তাহলে এই সব কাণ্ডের কর্ম্মকর্ত্তা হলে। তোমাকেই মনিটার করে দিলুম। তুমি যখন গান গাইতে পারো তখন তোমার অসাধ্য কিছু নেই। তুমি সব পারবে।”

তারপর তিনি আমাদের বাদবাকীদের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করতে লাগলেন ?—“কী, তোমাদের কেউ হারমোনিয়ম্ বাজাতে জানো নাকি ?”

“আমি সার্ একটা টেনিস্‌বল আমার দাড়ির ওপর দাঁড় করিয়ে রাখ্‌তে পারি।” বল্ল ফটিক—“হাত দিয়ে ধরা নেই, ছোঁয়া নেই, ভারী শক্ত।”

“আমি হারমোনিয়াম বাজাতে জানিনে বটে, তবে বাজলে বাজাতে পারব।” বল্ল রহমান্।—“যদি হারমোনিয়াম পাই আর যদি সেটা বাজতে চায়।”

"কী বাজাবে ?" হেড্‌মাষ্টার মশাই আগ্রহান্বিত হলেন— "কোন গৎ টৎ জানা আছে তোমার ? কনসার্টের মত একটা কিছু না হলে জলসা জমবে কেন ?"

"হ্যাঁ, গৎ জানি বই কি সার !" রহমান অম্লানবদনে জানালো "আকাশের চাঁদ ছিলরে —এই গৎটাই আমি বাজাব।"

"কেন ?" জিজ্ঞেস করলেন হরিনাথবাবু। "ঐটেই কেন ?"

"এই গৎটাই আমি জানি যে।" বল্ল রহমান্, "এ ছাড়া আর কোনো গৎই আমার জানা নেই।"

"ওকে ওটেই বাজাতে দিন্ সার্। ও বেশ ভালোই বাজাবে।" ফটিক সায় দিয়ে বল্ল: "ও কালো ঘরগুলোও বাজাতে পারে আমি দেখেছি। কালো ঘর বাজানো ভারী কঠিন।"

ছোট্ট মুকুল, এক পাশ থেকে বলে' উঠল হঠাৎ—"আমি বেশ ভালো হাঁস ডাকতে পারি কিন্তু।"

"দেখাও আমাদের"—হুকুম্ করলেন হেড্‌মাষ্টার।—"ডেকে দেখাও।"

মুকুল একে ছোটো তার ওপরে একটু লাজুক, সহসা এই আক্রমণে কেমন বিব্রত হয়ে পড়ল। কোনো শিল্পীকে যদি তড়িঘড়ি তার শিল্পসাধনার পরিচয় দিতে হয়—তার নিজ নৈপুণ্য প্রকট করার যতই প্রবল বাসনা থাক্‌না এবং যত বড় শিল্পীই হোক্ না কেন, স্বভাবতই একটু না ঘাব্‌ড়ে গিয়ে পারবে না।

মুকুল হাঁস ডাক্‌তে ইতস্ততঃ করে।

"কই, তোমার হাঁসের ডাক শুনি।" হেড্‌মাষ্টার মশাইও ছাড়বার পাত্র নন্‌—শোনার জন্য তিনি হাঁস্‌ ফাঁস্‌ করতে থাকেন।

"প্যাঁক—প্যাঁক্‌—প্যাঁক"—ডাকল মুকুল।

এবং একবার কোনো শিল্পী উস্‌কে উঠ্‌লেই মুসকিল। তখন তার প্যাঁক্‌ প্যাঁকানি থামানো যায় না।

"থামাও তোমার হাঁসের বাছি।" ভ্রুকুঞ্চিত করে' বল্লেন হেড্‌মাষ্টার।

যাই হোক্‌, কোনো রকমে একটা প্রোগ্রাম তো খাড়া করা হোলো—

ফাজিলাবাদ ইস্কুলের ছেলেদের

—সম্মিলিত জলসা—

হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের : বক্তৃতা

শ্রীমান্‌ মুকুল মৈত্র : হাঁসের ডাক

হেড্‌মাষ্টার মহাশয়ের : বক্তৃতা

রহমানের হারমোনিয়ম্‌ কনসার্ট :

('আকাশের চাঁদ ছিল রে!')

ফটিক চন্দ্রের : ম্যাজিক

(হাতে ধরা নেই, ছোঁয়া নেই, ভারী শক্ত)

—ইনটার্‌ভ্যাল—

চকর্‌বর্‌তির গানের গুতো :

'সেথা আমি কী গাহিব গান !'

সেই সঙ্গে

রহমানের হারমোনিয়ম-সঙ্গত্

('আকাশের চাঁদ ছিল রে' !)

ফটিক চন্দ্রের পুনশ্চ ম্যাজিক

শ্রীমান্ মুকুল মৈত্র :—আরো হাঁসের ডাক

হেড্মাষ্টার মহাশয়ের আবার বক্তৃতা

অবশেষে

বন্দে মাতরম্

মনিটার হিসেবে জলসার উদ্যোগ-আয়োজনের সব ভার আমার ওপর। আমাদের ছোট্ট টাউনের একমাত্র সিনেমা হাউসটি আমি ভাড়া করে ফেল্লাম। কিন্তু মুকুল বল্লে, "এই ছোট্ট হলে আমাদের সবাইকে ধরবে না সার্।"

মুকুল অবিশ্যি খুব ছোট্ট আর আমি নিশ্চয়ই খুব বড়ো, ফাস্ট্ ক্লাসেই পড়ি যখন, তবু মুকুলের এই অপ্রত্যাশিত সম্বোধনের সারাংশে সম্বলব্ধ মনিটারির আত্মপ্রসাদে আমি আত্মহারা হয়ে গেলাম। কিন্তু ও-ছাড়াও, মুকুলের মন্তব্য অন্য দিক দিয়েও সারগর্ভ বই কি ! ঠিক কথাই বলেছে ও, কিন্তু সারা টাউনে এই একটি মাত্র পাব্লিক্ হল—অথচ এর মধ্যে স্কুলের আদ্ধেক ছেলেকেও গুঁতো গুঁতি করে' আঁটানো যায় কিনা সন্দেহ।

সমস্যাটা হেড্মাষ্টার মশায়ের কাছে এনে উপস্থিত করা হোলো।

তিনি বল্লেন—"তাতে কি হয়েছে ? জলসা তা বলে' বন্ধ করা যায় না। অদ্ধেক ছেলেই দেখবে—কি করা যাবে ? কারা দেখ্‌বে, তোমরা নিজেদের মধ্যে লটারি করে' ঠিক করে নাও।"

এ ব্যবস্থা, বল্‌তে কি, ছেলেদের বেশ মনঃপূত হোলো। ছেলেরা লটারি করতে যেমন ভালোবাসে তেমন আর কিছু না। এমন কি ফুটবল্ খেলার গোলটা ঠিক ঠিক হয়েছে কি না, সে বিষয়েও তারা রেফারির চেয়ে লটারির ওপরেই বেশি নির্ভর করে।

অবশেষে সেই জলসা-রজনী এল। প্রত্যেকেই উৎসাহে আগ্রহে অধীর। ফটিকচন্দ্র তার বল্-ক্রীড়া নিখুঁত করবার আয়োজনে চোখ খইয়ে ফেল্‌ছে। সন্ধ্যে থেকেই সবলে সে শেষ-চেষ্টায় লেগেছে। মুকুল ষ্টেজের পেছনে গিয়ে নেপথ্য থেকে হংসধ্বনির রিহার্সাল দিচ্ছিল। আর রহমান এদিকে হারমোনিয়ম নিয়ে (সাদা কালো সব ঘরেই সে হাত চালাতে সমান ওস্তাদ) ক্ষেপে উঠেছিল—'আকাশের চাঁদের' ভেতর থেকে সে এমন সব অদ্ভুত অদ্ভুত সুর বার করে' এনেছে যা সে কোনোদিন পারবে বলে আশা করতে পারেনি। চলতি সিনেমার সমস্ত চালু সুরকে সে ওই একটামাত্র গতের মধ্যে এক সঙ্গে আমদানি করতে পারছিল।

আমার নিজের গানটাও এক আধ বার ভেঁজে নেবার দরকার ছিল কিন্তু রহমানের অত্যাচারে তার ফাঁক পাচ্ছিনে একটুও। রহমান রপ্ত করেই চলেছে, ওর সুরের আমদানি-

রপ্তানির বহরে এধারে আমার তো যায়-যায় অবস্থা। ওর সঙ্গতের সঙ্গে আমার সঙ্গীত যে কি করে' খাপ্ খাওয়াবো তাই ভেবে আমি কাহিল হচ্ছি। আমার গানের সাথে, রচনার ভাষাতেই, একটু সাফাই দেয়া আছে এটুকুই যা আমার সান্ত্বনা।

সবাই কৌতূহলে উদ্দীপ্ত, হেড্মাষ্টার মশাইও কারো চেয়ে কিছু কম নন্—কিন্তু দর্শকদের মধ্যে কেমন যেন লালসার অভাব। কি রকম যেন মনমরা-মনভরা ভাব! এমন একখানা জল্সা—এখানে এই শতাব্দীতে এই প্রথম—তার সঙ্গে জলযোগের কোনো সম্পর্ক নাই বা থাক্ল, তা, বলে' ছেলেদের স্বভাবসুলভ উৎসাহ লোপ পাবে, এই বা কেমন?

ছেলেরা ম্রিয়মাণ মুখে একে একে সিনেমা হলে ঢুকছিল। ঠিক যেমন করে' পাঁটারা খাঁড়ার তলায় দাঁড়ায়। তাদের হৈ হুল্লোড় কিচ্ছু নেই, টিকেট্ করে' সিনেমা দেখার সময়ে অন্ততঃ যতটা দেখা যায় তার একশ ভাগের এক ভাগও এই বিনে-পয়সার জল্সার বেলায় কেন দেখা যাচ্ছে না, এটা একটা বিস্ময়ের বিষয় বলেই বোধ হতে লাগল।

ব্যাপার কি, জান্তে আমি উদ্গ্রীব হলাম।

হেড্মাষ্টার মশায়ের দৃষ্টি অতিশয় যে তীক্ষ্ণ তা বলা যায় না, কিন্তু তাঁর নজরেও কেমন যেন এটা খোঁচাচ্ছিল। তিনি মুখে কিছু বল্ছিলেন না বটে, কিন্তু একটা প্রশ্ন-পত্র চোখে নিয়ে ঘুরছিলেন। অবশেষে সেকেন্ পণ্ডিতকে সাম্নে পেয়ে তিনি আর আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না। খচ্ খচ্ করে' উঠ্লেন।

"কী হয়েছে মশাই? ছেলেরা সব মুখ কালো কালো করে' আস্‌ছে কেন? লটারিতে কি কোনো গোলমাল—?"

"কিছু না। গোলমাল কি হবে? লটারিতে গোলমালের কি আছে?"

"যাক্‌, তবু ভালো।" দিল্‌দরিয়া একখানা হাসিতে হরিনাথবাবুর সারা মুখ ভরে গেল—"লটারিতে কোনো ত্রুটি হয়নি যে তবু ভালো। আপনার ওপর যখন লটারির ভার দিয়েছিলাম তখনই জানি সুষ্ঠুভাবে ওটা আপনি সুসম্পন্ন করবেন। যাক্‌, কারা কারা লটারি জিতেছে দেখা যাক্‌।"

"উঁহু, আপনি একটু ভুল করছেন।" হেড্‌মাষ্টারের কানে কানে ফিস্‌ ফিস্‌ করলেন সেকেন্‌ পণ্ডিত, সে ফিস্‌ফিসানি আমার কান অবদি এসে পৌঁছল। "এর মধ্যে লটারি-জেতারা কেউ নেই। তারা সবাই হোস্‌টেলে পিক্‌নিক্‌ করছে এখন। এরা লটারি-হারার দল।"

ইঁদুরদের দূর করো !

আমার জীবনস্মৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন-করা একটি পৃষ্ঠা—এক ছিন্নপত্রের কাহিনী এখানে বলব। আমার জীবন স্মৃতির সঙ্গে এই ছিন্নপত্রটি জড়ানো।

সবে ইস্কুল ছেড়ে মফস্বলের এক কলেজে ঢুকেছি—হোষ্টেলে থাকি। এক এক ঘরে চারজন ছ'জন আটজনের সীট। সীটের পাশেই পড়ার টেবিলের ওপরে আমাদের বইগুলি ইতস্তত: ছড়ানো কিম্বা এখানে ওখানে পুঁজি করা। অথচ কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত, আমাদের কাছে পড়ার বইয়ের কী মর্য্যাদাই না ছিল। ইস্কুলে পড়তে, ছোট্ট টেবিলের ওপরে, আমাদের বইগুলি মলাটের ওপর খবরের কাগজের মোড়ক পরে সুসজ্জিত হয়ে শোভা বিস্তার করতো এখনো মনে পড়ে। কেউ যদি তখন খবর-কাগজের বদলে, দেয়াল—ক্যালেণ্ডারের বাতিল-করা পাতায় পড়ার বই মোড়ার সুযোগ পেয়েছে তার সৌভাগ্যকে অকপটে আমরা ঈর্ষা করেছি। কিছুদিন আগেও, বইয়ের চেয়ে তার জড়োয়া গয়নার দানই বোধহয় বেশী ছিল। অবশ্যি বইয়ের খাতিরেই—কিন্তু এখন ? এখন মলাট দূরে থাক বইয়ে পর্য্যন্ত ভ্রূক্ষেপ করার আমাদের ফুরসৎ নেই বইয়ের চেয়ে তার নোটের দামই এখন বেশী আমাদের কাছে।

কিন্তু সে কথা নয়, সে দুঃখ জানিয়ে কি হবে, পুঁথিপত্র ছেড়ে এখন আমাদের গল্পের ছিন্নপত্রে যাওয়া যাক—

একদিন সকালে আমার ছোট টেবিলটার ওপর ঝুঁকে—আগের রাত্রে যে একস্ট্রা-টা কিছুতেই কষতে পারিনি তাই নিয়ে কাতর হয়ে রয়েছি এমন সময়ে—

ঢং ঢং—ঢঢাং ঢং ঢঢাং ঢং……

সকাল সাতটা না বাজতেই খাবারের ঘণ্টা ?

তবু, খাবারের ঘণ্টা হচ্ছে খাবারের ঘণ্টা—তা ভোর ছ'টাতেই হোক বা দিনে ছবার করেই হোক্—কিম্বা দিন ভোরই হতে থাক ! তাকে grudge করবার—গ্রাহ্য না করবার আমাদের ক্ষমতা ছিল না। কেননা আমাদের পেটে খিদের ঘণ্টা সব সময়েই বাজতো।

ঘণ্টাধ্বনি কানের ভেতর দিয়ে মরমে ভালো করে প্রবেশ করতে না করতেই, সব ছেলে আমরা, সোরগোল করে' হোষ্টেলের হেঁসেল ঘরে গিয়ে হাজির।

কিন্তু না দুঃখের বিষয়. খাবার ঘণ্টা নয় !

হোষ্টেলের সুপারিণ্টেণ্ডেন্টের নিজের কি এক দরকার পড়েছে তাই তিনি ঘণ্টার মারফতে সমবেত আমাদের উদ্দেশে এই ভাবে হাঁক-ডাক ছেড়েচেন। সেই কারণেই এই এক চিঠিতেই সকলের আমন্ত্রণ !

খাবারের ঘণ্টা নয়—বরং খাবারের বেলায় ঘণ্টা ! ভারী দমে গেলুম। ভোগ নেই কিছু নেই, তেমন ঘণ্টাকর্ণপূজায় আমাদের উৎসাহ নেই—সার্ব্বজনীন হলেও না। ভারী মন খারাপ হয়ে গেল। বেয়ারিং পোস্টে ফের যে নিজের বিছানায় ফিরে আসবো—যথাস্থানে ফেরৎ এসে চিৎপাত হয়ে মনের দুঃখ লাঘব করব তারও

যো যেই—ঠিকানা বদ্‌লি হয়ে ক্ষুণ্নমনে সবাইকে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ঘরে গিয়ে জমা হতে হোলো।

"দেখেচ? দেখেচ কাণ্ডখানা? ইঁদুরের বাঁদরামিটা দেখেচ একবারে?"

যাবামাত্রই, এই প্রশ্ন মুখে করে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মশাই আমাদের সবাইকে অভ্যর্থনা জানালেন।

এবং বলতে, না বলতে ইঁদুরে-কুরে খাওয়া, প্রায় সাড়ে তিনভাগ সাবড়ে-দেয়া, একখানা খামের চিঠি আমাদের সবার নাকের সাম্‌নে তিনি তুলে ধরলেন।

"দেখেচ! চিঠিখানার কিছু রাখেনি! হাড় পাঁজরা ঝরঝরে করে' দিয়েচে! আগাপাশতলা সব খতম; ছাখো দেখি একবার; চেয়ে ছাখো!"

আমরা, রবীন্দ্রনাথের কৃত নয়, ইঁদুরের কাণ্ড—সেই ছিন্নপত্র—উক্ত দুষ্কৃতকর্ম্ম স্বচক্ষে নির্নিমেষে তাকিয়ে দেখলাম। আহত খামখানাকে খামোখা দুঃখের ভান করে' দেখবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

"আমার বাড়ীর চিঠি! পারিবারিক চিঠি আমার। ভয়ঙ্কর জরুরি চিঠি; এখনো এর জবাব দেয়া হয় নি—ছাখো তো কীক্—কাণ্ড!"

"খারাপ! খুবই খারাপ!" আমাদেব মধ্যে থেকে মনিটর বলে' উঠ্‌ল আগে: "ইঁদুরদের এ খুব অন্যায় কাজ একথা বলতে আমি বাধ্য।"

"ইঁদুরদের এটা উচিত হয়নি।" আমিও না বলে থাকতে পারিনে। "খামটার ওপরে কি প্রাইভেট বলে কিছু লেখা ছিল না নাকি?"

"থাক্‌লেই বা কি? কী তাতে? ইঁদুররা কি প্রাইভেট পার্সনাল এসব কিছু মেনে চলে?" সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমার কথায় ভারী খাপপা হয়ে উঠলেন। "তারা কি ইংরেজি পড়তে পারে? না পড়লে বুঝতে পারে? মাথামুণ্ডু সাহিত্যের কোনো কিছু কি বোঝে ওরা?"

"ওর কথা ধরবেন না সার। ও নেহাৎ ছেলে মানুষ।" বল্লে মনিটার।

"হায় হায়! এখন আমি কী যে করি। কী করে এর উত্তর দিই! কী যে জবাব দেবার ছিল, চিঠিটার বিন্দু বিসর্গ কিছুই আমার মনে নেই—কিচ্ছু মনে পড়ছে না। চিঠিটার ওপর ওপর চোখ বুলিয়ে গেছি কেবল—কে জানে এমন হবে! প্রকাণ্ড একটা কেনাকাটার ফর্দ্দ ছিল এইটুকুই শুধু স্মরণে আছে!"

ইঁদুরদের অমানুষিক আচরণে ইতর প্রাণীসুলভ এই নিতান্ত অভদ্রতায় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মশাই এমনই কাতর হয়ে পড়েন যে মর্ম্মাহত সমস্ত ছেলের সমবেদনা আমার সহানুভূতি মনিটারের সান্ত্বনা কিছুই তাঁকে শান্ত করতে পারে না।

বিস্তর হাহুতাশের পর অবশেষে তিনি প্রকাশ করেন—"কিন্তু বারম্বার এরকম হলে তো চল্‌বে না। জরুরি চিঠিপত্র সব আমার! কখন্ আসে তার ঠিক নেই। ইঁদুরদের তাড়াবার তোমরা ব্যবস্থা করো!"—

এতদিন আমরা সুপারিন্টেণ্ডেন্টের রুদ্র মুর্ত্তিই দেখে এসেছি। তাঁর বীরোচিত হাবভাব দেখতেই অভ্যস্ত ছিলাম। সামান্ত একটা পত্রের বিরহে তাঁর যাবতীয় বীরত্ব যে এভাবে খসে পড়বে সমস্তটা এতখানি করুণ হয়ে দেখা দেবে তা কে ভাবতে পেরেছিল ?

কিন্তু আস্তে আস্তে তাঁর বীর রস ফিরে আসতে থাকে—হঠাৎ তিনি ভয়ঙ্কর চোটপাট করে ওঠেন।

—"না—না—না! ওসব কথা শুন্‌ছিনে, ইঁদুরদের দূর করো। এক্ষুনি তাড়াও ওদের। মেরে ধরে যেমন করে পারো ভাগাও আগে ওরা বিদায় নেবে তারপরে আমি জলগ্রহণ করব।"

মনিটারকে লক্ষ্য করে কেবল এই হুকুম্‌ই নয় একটা হুম্‌কিও তিনি ত্যাগ করলেন।

"আজ্ঞে—আজ্ঞে—কি করে তাড়াব ?" মনিটার ভারী কিন্তু-কিন্তু হয়ে পড়ে।—ওরা কি যাবার ?

"নোটিশবোর্ডে একটা নোটিশ লটকে দিলে হয় না ?" কে একজন বলে ওঠে আমাদের ভেতর থেকে !

"তাছাড়া তাড়ালে কি ওরা যাবে ? মানে মানে—তাড়ানো কি যাবে ওদের ?"

মনিটার আম্‌তা আমতা করে বলবার চেষ্টা পায়। ওর মনের সংশয় ওর চোখে মুখে আর প্রত্যেক কথায় ফুটে উঠতে থাকে।

"মানে মানে না যায় অপমান করে তাড়াও।" আমি বাৎলাই। আমাকে ছেলেমানুষ বলার জন্যে মনিটারের ছেলেমানুষির প্রতিশোধ নিই।

মনিটার আমার দিকে কটমট করে' তাকায়।

"হ্যাঁ, আমারও সেই কথা।" সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট আমার কথায় সায় ছ্যান্। "সহজে না যায়, উত্তম মধ্যম দিয়ে যেমন করে পারো দূর করো! হ্যাঁঃ, ওদের আবার মান অপমান!"

"দেখুন সার্, ইঁদুরদের আমরা যতই ডিস্‌লাইক্ করিনে কেন, ওরা হয়তো আমাদের ততটা অপছন্দ নাও করতে পার—এই ধরুন, যেমন ছারপোকারা—"

মনিটার ওঁকে বোঝাবার চেষ্টা করে। "আমরা দূর করতে চাইলেও ওরা হয়তো আমাদের ছেড়ে যেতে চাইবে না। কারণ, —কারণ—"

"কারণ ওদের তো হোষ্টেলে থাকা-খাওয়ার খরচা দিতে হয় না।" কারণটা কোন্ একটি ছেলে ভিড়ের ভেতর থেকে বিশদ করে' ছ্যায়।

"আর অখাদ্য খেয়েও ওরা টিকে থাকতে পারে।" আমি বলে' উঠি! "ঠিক আমাদের মতন নয়।"

"ওসব আমি জানিনে! হয় ইঁদুরদের তাড়াও যেমন করে' পারো—নয়তো তোমার মনিটারিও গেল!"

সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এই শব্দভেদী বাণ ছেড়ে—মনিটারের মর্ম্মভেদ করে,' ছিন্নপত্র হাতে, প্রিন্সিপালের ঘরের দিকে রওনা দিলেন।—

আর আমরা সবাই খুসিতে টইটুম্বুর হয়ে উঠলাম। এই ছেলেটির মনিটারির ওপরে আমরা সবাই হাড়ে হাড়ে চটে ছিলাম। খারাপ খাওয়াতে এরকম ওস্তাদ আর দুটি ছিল না। অখাদ্য তবু

বা কোনোরকমে সওয়া যায়, কিন্তু তার ওপরে—তারও ওপরে—বোঝার উপরন্তু শাকের আঁটিটির মতো—হোষ্টেলের ডিউ আদায় করতে যা জোর জুলুম লাগাতো তা অসহ্য। সারা মাস ধরে এক ঘঁ্যাট-চচ্চড়ির গাদা আর সারা মাস ধরে একই তাগাদা—খেয়ে খেয়ে আমরা তো অস্থির হয়ে পড়েছিলাম। যাক, ইঁদুর আর স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট—এই তুই জবরদস্তের পাল্লায় পড়ে হতভাগা এবার খুব জব্দ হবে, ভেবে আমাদের এমন আনন্দ হোলো যে কী বল্‌ব।

অসহায় দৃষ্টিতে মনিটার একবার আমাদের সবাকার দিকে তাকালো। তারপর সকাতর কণ্ঠে বলে: "ইঁদুর তাড়াতে হলে কি করতে কি করে' থাকো তোমরা?"

"কিচ্ছু করি না।" আমরা একবাক্যে বলে' দিই। "তাছাড়া, সে মাথা ব্যাথা তো আমাদের নয়; তোমার।"

"হুঁ, হয়েছে।—" বড়দরের আবিষ্কারকের মত মুখখানা করে মনিটার অকস্মাৎ লাফিয়ে উঠে। "ইঁদুরধরা কল। জাঁতিকল যার নাম।—তাই! তাইতো দরকার! এক্ষুনি বাজারে গিয়ে আমি কিনে আন্‌ছি গোটাকতক।"

এই বলে ভুরু কুঁচকে, আমাদের দিকে তু চোখের দারুণ বিষদৃষ্টি হেনে, হন্ হন করে বেরিয়ে গেল মনিটার।

সেই সকালে বেরিয়ে সন্ধ্যের মুখে এক ঝাঁকা জাঁতিকল ঘাড়ে করে মনিটার ফিরে এল। এক আধটা নয়, আটচল্লিশটা জাঁতিকল, কেবল বাজারে কুলোয়নি, বাড়ী বাড়ী ঘুরে যোগাড় করতে হয়েছে। ইঁদুরদের বজ্জাতির বিরুদ্ধে মনিটারের এই বিজাতীয় অভিযান।

জাঁতিকলগুলোর মাথায় ছোট ছোট চালের পুট্‌লির নিমন্ত্রণপত্র লাগিয়ে এখানে ওখানে সেখানে—স্থানে অস্থানে চারধারে সে চারিয়ে দিল। ইঁদুরদের জন্য ওৎ পেতে রাখ্‌লে সব জায়গায়। এমন সব জায়গায়, যেখানে কোনো ভবঘুরে ইঁদুরও ভুলেও কখনো পা বাড়ায় না। আর পা বাড়ালেও—এই সব পাতানো সম্পর্কে—এই ধরণের ফাঁদে মাথা গলাবে কিনা আমার ঘোরতর সন্দেহ ছিল। বরং, আজকালকার চালাক চতুর যতো ইঁদুর—এই সেকেলে ব্যবহারে—চটে যদি নাও যায়, একটু মুচকি হেসেই চলে যাবে, এই আমার বিশ্বাস।

আমাদের মনিটার কিন্তু খুব সিরিয়স্‌। এই সব ক্রিয়াকাণ্ড সেরে ইঁদুর পড়ার প্রতীক্ষায় সে উৎসুক—একাগ্র—উৎকর্ণ হয়ে অপেক্ষা করতে লাগ্‌ল।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হোলো না। খানিক পরেই ধারালো একটা তার-স্বর চারিধার বিদীর্ণ করে ফেটে পড়ল। কিন্তু কোনো ইঁদুরের কণ্ঠনিসৃত নয়, খোদ্‌ আমাদের সুপারিণ্টেণ্ডেন্টের।

মনিটার ইঁদুর তাড়াবার কী যেন সব করেছে তাঁর কানে গেছল, তার ফলে কতগুলি ইঁদুর এতক্ষণে বিদূরিত হোলো জানবার জন্যে তাঁর তর্‌ সইছিল না। মনিটারের সঙ্গে সাক্ষাতের লালসায় দোতলা থেকে তিনি তর্‌ তর করে' নামছিলেন, এমন সময়ে সিঁড়ির ধাপে, লুক্কাইত ভাবে অপেক্ষমাণ একটা জাঁতিকলে তাঁর পা আটকে যাওয়াতেই এই আর্ত্তনাদ! সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-নির্গত এই তীব্র নিনাদ!

মনিটারের প্রথম শিকার—সুপারিন্টেণ্ডেন্টের তিন তিনটে পায়ের আঙুল।

"কী কাণ্ড! উঃ কি কাণ্ড!"—চেঁচিয়ে হোষ্টেল ফাটিয়ে মনিটারকে সামনে পেয়ে তেলে বেগুনে তিনি জ্বলে উঠলেন। "এই তোমার ইঁদুর তাড়ানো? কী সব মারাত্মক যন্ত্র!—এক্ষুনি এইসব যন্ত্রনা এখান থেকে খেদিয়ে দাও! হোষ্টেলের কোথ্থাও যেন এসব যন্ত্রপাতি না থাকে! নইলে তোমার মনিটারি তো গেলই, তুমিও গেলে! ইঁদুর তাড়াতে না পারি, তোমাকে আমি তাড়াবো।"

জাঁতিকলটাকে সুপারিন্টেণ্ডেন্টের পা থেকে ছাড়িয়ে এনে নিঃশব্দে অধোমুখে মনিটার যেন মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গেছল। তার কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

আর সেই যে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট চূড়ান্ত কথাটি বলে দিয়ে আহত আঙুল তিনটি স্বহস্তে ধারণ করে'—তখনো তারা পদচ্যুত হয়নি একেবারে—ঠায় এক পায় দাঁড়িয়ে রইলেন, যতক্ষণ মনিটার তার সমস্ত ভয়াবহ কলকৌশল কুড়িয়ে বাড়িয়ে হোষ্টেলের ত্রিসীমানার বাইরে একেবারে অনেক দূরে নিয়ে গিয়ে নিক্ষেপ করে' ফিরে এল, ততক্ষণ সিঁড়ির সেই ধাপ্‌টি থেকে আর এক পাও তিনি নড়লেন না।

জাঁতিকলরা চলে গেল কিন্তু ইঁদুরজাতি গেল না—মনিটারের মুরুব্বিগিরি এদিকে যায় যায়! কী করে বেচারী! তক্ষুনি আবার সে বাজারের দিকে রওনা দিল। সেই রাত্রেই নিয়ে এল একগাদা

ইঁদুরমারা বিষ—আর দ্বিগুণ উৎসাহে তাই সে ছড়িয়ে দিল হোষ্টেলের দিগ্বিদিকে।

"এত গন্ধ কেন?" পরদিন সকালে তদারকে এসে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মশাই জিজ্ঞেস করলেন সবাইকে। "এমন বিচ্ছিরি গন্ধ কিসের!"

"মনিটারের গন্ধ সার্।" আমরা জানালাম।

"মনিটারের গন্ধ? তার মানে?" সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারেন না। বোধ হয় তাঁর নিজের নাকের ওপরেও অবিশ্বাস জন্মে যায়।

"আজ্ঞে, মনিটারের নিজের গন্ধ না।" আমাকেই তাঁর নাসিকা-কর্ণের বিবাদভঞ্জন করে' দিতে হয়। "ইঁদুর তাড়ানোর জন্যে চার ধারে সে কী সব ছড়িয়েচে তারই সৌরভ।"

"সৌরভ; ছি—ছি—ছি!" সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট একবাক্যে ছি ছি করতে লাগলেন। "ভারী বিচ্ছিরি তোমাদের রুচি। নাক বলে, কিছু কি নেই তোমাদের? কোথায় গেল সে নাক-না ওয়ালা?—"

হাঁক পড়তেই সে' হাজির।

"কী এসব ছড়িয়েচ? দুর্গন্ধে আমার গা বমি বমি করছে। অন্নপ্রাশনের ভাত উঠে এল বলে'। এক্ষুনি এই সব গন্ধমাদন হটাও এখান থেকে।" সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের গলায় করাত। "আগে হটাও, তারপরে অন্য কথা।"

"কি করে' হটাবো সার্?" কাঁদো কাঁদো হয়ে বল্ল মনিটার। "এতো জাঁতিকল না যে সরিয়ে ফেল্‌ব! ইঁদুরমারা বিষ; ছড়িয়ে

দেয়া হয়েছে, লেপ্টে সেঁটে গেছে মাটিতে—এখন একে তুলি কি করে ?"

"এম্নি না ওঠে, না উঠ্তে চায় যদি—তুমি চেটে শেষ করো! অতশত আমি জানিনে।" এই বলে' চটে মটে, চাট্বার ব্যবস্থাপত্র দিয়ে, নাকে রুমাল চেপে চলে গেলেন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।

যতই চাটুকারিতা থাক্ বিষ চেটে সাবাড় করা কোনো মনিটারের কর্ম্ম না!

জনমজুর ডাকিয়ে চারশো বালতি জল ঢেলে সমস্ত দিন হন্তদন্ত হয়ে হোষ্টেল সাফ্ করতে হলো মনিটারকে। একদিনের এই পরিশ্রমেই আধখানা হয়ে গেল বেচারা!

ইঁদুর-মারা বিষ দূরীভূত হোলো। আমরা নিশ্বাস নিয়ে বাঁচলাম।

ইঁদুররা কি করে' এতক্ষণ কাটিয়েছে ওরাই জানে। কিন্তু কাল রাত থেকে রুদ্ধ নিশ্বাসে বাস করে' কী কষ্ট যে গেছে আমাদের, ভাবতেও—উঃ!

মনিটার কিন্তু বেপরোয়া। যে করেই হোক' ইঁদুর তাড়িয়ে তার মনিটারি বজায় রাখ্বেই—যেম্নি মরিয়া তেম্নি সে নাছোড়বান্দা! তৃতীয় দিনে বাজারে গিয়ে সে একটা হুলো বেড়াল পাকড়ে নিয়ে এল। মিশ্মিশে কালো। "এইবার জব্দ হবে ইঁদুর!" মনিটারের চোখেমুখে পরিতৃপ্তির হাসি ছাড়িয়ে পড়ে। "এই বেড়ালেই ওদের জলযোগ করে' ফিনিশ করবে।"

কিন্তু দুঃখের বিষয় ইঁদুরদের পিক্নিক্ করার দিকে বেড়ালটির

তেমন উৎসাহ দেখা গেল না। ইঁদুরের চেয়ে রান্নাঘরের মাছের দিকেই ওর বেশী আগ্রহ প্রকাশ পেল।

এমন কি, তার ফিনিশিং টাচ্ দিতেও সে দ্বিধা করল না। খোদ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পাত থেকেই মাছের মুড়োটা থাবা মেরে তুলে নিয়ে সটকান দিল একদিন!—

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কঠোর মন্তব্যে মনিটারের রুচির প্রতি ক্রুর কটাক্ষ করলেন—"ধেড়ে ছেলের বেড়াল পোষবার সখ ছ্যাখো! এসব মামার বাড়ীর আবদার এখানে শোভা পায় না", স্পষ্ট ভাষাতেই জানিয়ে দিলেন। এবং বেড়ালটার প্রতি কেবলমাত্র কটাক্ষ করলেন, তার বেশী আর কিছু করলেন না। করবার ছিলও না কিছু, কেননা নাগালের বাইরে গিয়েই মুড়োটাকে গালের ভেতরে বাগাবার চেষ্টায় সে ব্যস্ত ছিল তখন!

কিন্তু যেদিন রাত্রে অন্ধকারে দেখতে না পেয়ে বেড়ালটার তিনি ল্যাজ মাড়িয়ে দিলেন আর বেড়ালটা খাঁক্ করে তাঁকে আঁচড়ে কামড়ে একশা করল সেদিন আর রক্ষা থাক্‌ল না!

সারা হোষ্টেলময় সমস্ত রাত তিনি দাপাদাপি করে বেড়ালেন! —কী সর্ব্বনাশ ছ্যাখো দিকি! বেড়ালে কামড়ালে কী-হয় কে জানে! কুকুরে কামড়ালে তো জলাতঙ্ক হয় ইঁদুরে কামড়ালে র‍্যাট ফিভার হয়ে যায়—এখন বেড়ালের কামড়ের ফলে—কী জানি কী যে হবে!—এই কামড় কতদূর যে গড়াতে পারে ভেবে ভেবে তিনি আকুল হয়ে ওঠেন!

"হয়তো স্থলাতঙ্ক হতে পারে।" ওরকম ব্যাকুলতা দেখে তাঁর

দুর্ভাবনা দূর করার মানসেই সান্ত্বনাচ্ছলে আমি বলি।—"তার বেশী কিছু হবে না সার্।"

"য়্যাঁ? কি বল্লে? স্থলাতঙ্ক? তাহলেই তো গেছি! বেড়াল কামড়ানোয় স্থলাতঙ্ক হয় না কি? কী সর্ব্বনাশ! তাহলে কোন্ স্থলে গিয়ে বাঁচবো? এবার আমি মরলুম—সত্যই মারা গেলুম এবার। এতদিন বেঁচে থেকে আর বাঁচা গেল না। এই মনিটারটি আমায় মারল। ওর বোকামির জন্যেই এইভাবে বেঘোরে আমায় মরতে হোলো।"

মনিটার যতই তাঁকে বোঝায় বেড়ালে কামড়ালে কিসস্যু হয় না সমস্ত কেবল আমার চালাকি, ততই তিনি আরো ক্ষেপে ওঠেন।

"হ্যাঁ কিসস্যু হয় না! হয় না। তোমার মাথা! তুমি জানো! তুমি জানো সব! ফের যদি তোমার ঐ ইষ্টুপিট বেড়ালকে এই হোষ্টেলে দেখি তাহলে দেখে নেব! এতই যদি তোমার বেড়াল পোষার বাতিক নিজের বাড়ী নিয়ে গিয়ে সখ মেটাও না বাপু!"

এ পর্য্যন্ত মনিটার কোনো রকমে সয়েছিল—এত লাঞ্ছনাতেও কিছু বলে নি। কিন্তু নিজের সখের খাতিরে ওর বেড়াল পোষার বাতিক এই অভিযোগে এমন ও শক পেল যে ওর মাথা খারাপ হয়ে গেল। আর সহ্য করতে না পেরে এক পদাঘাতে সামনের মুক্ত দ্বারপথে বেড়ালটাকে বিবাগী করে দিল। টি-এম-ও করে দিল তৎক্ষণাৎ।

এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, পেছনের দরজা দিয়ে ফিরে এল বেড়ালটা !

মনিটার এবার ওকে করায়ত্ত করে ক্রিকেটবলের মতো হাঁকৃড়ে ফের আবার বার করে' দিল।

এবং পুনরায় সে ঘুরে এল —এবার এল জানালা দিয়ে।

মনিটার তার দিকে তাক্ করে' বই খাতা ছুঁড়ে লাগায় আর সেও যার পা সামনে পায় আঁচড়ে কামড়ে তার শোধ তোলে।

এই ভাবে সে একবারে খোদ প্রিন্সিপালের পা সম্মুখে পেয়ে গেল—এমন হৈ-চৈ-কাণ্ডটা কিসের এই খোঁজ নিতেই আসছিলেন —এখন নিজের পায়েই তার পরিচয় পেয়ে, লেটেস্ট নিউজ্ বহন করে' বিরক্ত হয়ে তিনি চলে গেলেন। যাবার সময়ে শাসিয়ে গেলেন' কালকেই তিনি রাষ্টিকেট করে' ছাড়বেন।

তারপর সত্যিই যেন স্কুলাতঙ্ক বেধে গেল! বেড়ালতো ক্ষেপে ছিলই, মনিটারও ক্ষেপে গেল যেন। প্রিন্সিপাল পরিষ্কার করে না বলে' গেলেও, বেড়াল যে নয়, ওর বরাতেই যে উক্ত রাজটিকা উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে, কেমন করে' যেন ওর ধারণা হয়ে গেছল। চেঁচিয়ে মেচিয়ে তুল্‌তামাল্ করে' তীরবেগে বেরিয়ে গেল মনিটার।

তারপর বহুক্ষণ বাদে, টল্‌তে টল্‌তে, কোথ্ থেকে এক খেঁকি কুকুর নিয়ে এসে সে হাজির হোলো।

"কই, কোথায় গেল সেই অপয়া হতচ্ছাড়া ?" এসেই, চোখ মুখ পাকিয়ে, চারধারে সে বেড়ালের খোঁজ করতে থাকল।

তারপর থেকে ঘটনার গতি দ্রুতবেগে ধাবিত হোলো। এবং

বেড়ালটাও। কুকুরের আভাস দেখবামাত্রই সে উধাও হয়েছিল। আর বেড়ালের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে পলকের মধ্যে, ইঁদুররা সদল-বলে ফিরে এল আবার। প্রকাশ্যভাবেই তারা পায়চারি করতে আরম্ভ কর্‌ল—কুকুরটার চোখের সামনেই অসঙ্কোচে এধারে ওধারে ছুটোছুটি লাগিয়ে দিল। এবং সেই খেঁকি কুকুরটা ইতিমধ্যে আর কোনো কাজ না পেয়ে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অন্য পায়ে কাম্‌ড়ে দিয়েছে, খাবার ঘরের বাসনপত্র ভেঙে চুরে তছনছ করে একাকার করেছে আর রান্নাঘরের অধিষ্ঠাতা দেবতা উড়ে ঠাকুরকে (কুকুরের ধমক্ শোনবামাত্রেই তো সে উড়ে দৌড়।) পেয়ারা গাছের মগডালে তুলে রেখে এসেছে।

এবং দুর্ঘটনার ওপর দুর্ঘটনা। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বিপদের বার্ত্তা পেয়ে,—বেড়ালের কামড়ের পরে কুকুরের কামড়ানির কথা তাঁর কানে যেতেই—স্বয়ং প্রিন্সিপাল্ মনিটারকে পরদিবস রাষ্টিকেটের করবার কর্ত্তব্য আপাতত মুল্‌তুবি রেখে চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে তল্‌পি তল্‌পা গুটিয়ে সেই দণ্ডেই সরে পড়েছেন শোনা গেল।

আর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, এক পায়ে বেড়ালের, অন্য পায়ে কুকুরের দংশন-চিহ্ন ধারণ করে', অনন্যোপায় হয়ে প্রিন্সিপালের পদাঙ্ক অনুসরণ করবেন কি না স্থির করতে লাগলেন। তাঁর পোঁটলা পুঁটলি বাঁধতেই যা বাকী। আর মনিটার? তার কোনো পাত্তা নেই। খুব সম্ভব, কুকুরকে নিষ্কাশিত করার মৎলবে, হাতীঘোড়া একটা কিনে আনবার জন্যেই সে

বাজারের দিকে-ধাওয়া করেছে এবার। অন্ততঃ, আমার তো তাই ধারণা।

আমরা বিছানার উপর টেবিল চাপিয়ে যে যার ছোট্ট টেবিলের ওপরে কম্পান্বিত কলেবরে দাঁড়িয়ে আছি।

এদিকে ইঁদুররাও সগৌরবে আনাচে কানাচে সর্ব্বত্র ফের ঘুর ঘুর করতে সুরু করেচে। কোনো দিকে তাদের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই।

আর এধারে কুকুরের লম্ফ ঝম্প ছ্যাখে কে।

কোনো খেলাই সহজ নয়

শরীর সুস্থ রাখতে ব্যায়ামের দরকার। আর ব্যায়ামটা যদি খেলাধুলার ছলে নিজের অগোচরে হয়ে যায় সেটা ভালো আরো। কিন্তু সব খেলাধুলা আবার আমার পোষায় না। লুডো, দাবাবোড়ে, স্নেক্ এ্যাণ্ড ল্যাডার এ সব খেলাকে সহজেই আমি পোষ মানাতে পারি বটে, কিন্তু ওগুলোতে তেমন নাকি ব্যায়াম নেই। এধারে ফুটবল্ ক্রিকেট—এসব খেলার সঙ্গে গায়ের জোরে আমি পেরে উঠিনে—'রাগবি?' ও বাবা! রাগবি খেলায় লাগবার মতো রাগবার অতো ক্ষমতা নেই আমার। রেগেমেগে কিছু করা আমার অসাধ্য। রাগ-রাগিনী-রাগ্‌বি—এসব আমার সয় না।

অবশেষে ব্যাড্‌মিণ্টনকেই অনেক বেছে ধরা গেল! এককালে এই খেলাটারই যা একটু আমার অভ্যেস ছিল। এই খেলাটাই ধরা যাক্? কিন্তু আমার সঙ্গে এ বিষয়ে উদ্যোগী হবে এমন আরেকজনকেও ধরা চাই তো? মুস্কিল হয়েছে, ধর্ত্তব্যের মধ্যে পড়ে এমন একটা লোকও এ পড়ায় নেই! অনেক করে' ধরাধরি করে' অশোককে পাওয়া গেল অবশেষে।

অশোক কিন্তু গাঁইগুঁই করে, কিছুতে খেলতেই রাজি হয় না বলে, "আমি ভাই ও খেলার কিছুই জানিনে।"

"শিখে ফেলতে পারবে। শিখতে কতক্ষণ?" আমি ওকে উৎসাহ দিই; সত্যি বলতে আমার নিজেরও তো সবেমাত্র সুরু।

ক' মাসই বা খেলছি। অবিশ্যি আগের একটু অভ্যাস ছিল কিন্তু সেও কতকাল আগে! দু'একদিন অভ্যেস করলে তুমিও আমার মতন ভাল—কিম্বা আমার মতই খারাপ খেলতে পারবে। আশ্চর্য্য নয়।"

অশোক তবুও ঘাড় নাড়ে। খেলাধূলায় এতদূর নারাজ হতে পারে এমন ছেলে এর আগে আমার নজরে পড়েনি।

"খেলাধূলা আমি চিরদিনের মত ছেড়ে দিয়েছি ভাই।" বল্ল অশোক: "খেল্‌লে আমার ভারী মন খারাপ হয়। তবে আমি যে হেরে যাই কি খারাপ খেলি তার জন্য না। খারাপও খেলি না, আর হারিও না বড় একটা, তবে বড্ড ভুল খেলে থাকি। এই জন্যই মনকষ্ট পাই। অনর্থক মনকে আর কষ্ট দিতে ভাল লাগে না।" এই বলে' সে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ল।

"ভুল খ্যালো, তার মানে?" আমি জিজ্ঞেস না করে পারিনা।

"ছোটবেলা থেকেই ভুল খেলি—যে খেলাই খেলতে যাই। তার জন্য ওস্তাদের কাছ থেকে কী কম বকুনিটাই খেয়েছি! প্রথম যখন ক্রিকেট খেল্‌তে ধরলাম, ইস্কুলে পড়ি তখন। আমাদের গেম্ মাষ্টার বল্লেন, "অশোক, তুমি ব্যাট ঠিক ধরতে পারছ না।" আমি তো ভারী ধাঁধাঁয় পড়ে গেলাম। ধরেছি তো, আবার কি ক'রে ব্যাট্ ধরতে হয়? আমার নিজের ধারণামত ব্যাট্‌কে আমি দস্তুরমতই ধরেছিলাম। কেবল ধরা কেন, পাকড়ে ছিলাম বল্লেই ঠিক হয়। কিন্তু ওই ধরনের ব্যাট-ধারণ গেম মাষ্টরের মনঃপুত নয়। তিনি বল্লেন, 'ধরতে পেরেছি। কেন তোমার এই ধারা গলদ হচ্ছে ধরা গেছে। তুমি কি কখনো ডাণ্ডাগুলি খেলতে? খেলতে নাকি?'

'একটু আধটু'—আমি স্বীকার করলাম, 'কখন সখনো—এই পাড়ার ছেলেদের সঙ্গেই।' "বোঝা গেল এইবার।" বল্লেন গেম মাষ্টার, "সেই ডাণ্ডাগুলির ডাণ্ডার মতই তুমি ব্যাট পাক্‌ড়েছ বটে। ওভাবে ধরা নিয়ম নয়। ক্রিকেট্‌ খেলার একটা ষ্টাইল্‌ আছে। সে ষ্টাইলই হোলো আলাদা।" এই বল্লেন গেম্‌ মাষ্টার।" বল্‌তে বল্‌তে অশোক থামল।

"গেম মাষ্টার ঠিক কথাই বলেছিলেন।" আমি বল্লাম।

"সে কথার আমি প্রতিবাদ করি না। গেম্‌ মাষ্টার আরো বল্লেন যে ক্রিকেটে আমি কোনদিন শাইন্‌ করতে পারব না—যদি না ঐ ভাবে ব্যাট্‌ ধরার বদঅভ্যাস আমি ছাড়তে পারি। অবশ্যি, তাঁর ঐ বলার পরেই পর পর আমি চারটে বাউণ্ডারি করে' দিলাম তাঁর দেওয়া বলের বিরুদ্ধেই, ঐ ভাবে ব্যাট ধরেই যদিও। কিন্তু তবু তিনি খুসি হলেন না বা তাঁর মত্‌ বদলানোর বিশেষ কোনো কারণ খুঁজে পেলেন না।"

অশোক মুখভার করে তার শোকাবহ জীবনকাহিনী ব্যক্ত করে চল্‌ল।

ঐ ক্রিকেট-কাণ্ডের কয়েক মাস পরে, অশোক বল্ল আমায়, সে একবার টেনিস খেলা ধরেছিল। এমন কি, একটা ইণ্টার স্কুল টেনিস প্রতিযোগিতায় নেমেছিল পর্য্যন্ত। এই প্রতিযোগিতায় যে ছেলেটি তার প্রতিদ্বন্দ্বী দাঁড়ায় তার বাবা বিখ্যাত ফরাসী প্লেয়ার কোশের সঙ্গে একহাত খেলেছিলেন—কোশে যখন কলকাতায় এসেছিলেন সেই সময়ে। কাজেই, তাকে যে কোনো

ছেলে হারাতে পারবে এ আশা কেউ করেনি, সে নিজেও না, অশোকও নয়। কিন্তু, কি আশ্চর্য, কি করে বলা যায় না, অশোক তাকে সব কটা সেটেই হারিয়ে দিল।

সেই ছেলেটি, খেলা শেষ হয়ে গেলে, অশোককে ডেকে বলছিল, "খোকা, বয়েসের তুলনায় তুমি ভালোই খ্যালো একথা বলতে আমার বাধা নেই, কিন্তু আমার ভয় হয়, কোনো-দিনই তুমি প্রথম শ্রেণীর টেনিস প্লেয়ার হতে পারবে না। কোশের মত হওয়া দূরে থাক, আমার বাবার মতও নয়। তুমি যে ভাবে র‍্যাকেট ধরেছিলে অমন করে' র‍্যাকেট ধরতে এর আগে আর কাউকে আমি দেখিনি। তুমি কি কখনো ক্রিকেট খেলতে ?"

"কিছুদিন আগে খেলেছিলাম।" বলতে হোলো অশোককে। "এক আধবার। সে নামমাত্র। কবে ছেড়ে দিয়েছি।"

শোনবামাত্রই ছেলেটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, সে বলল, "ধরেচি ঠিক। কেন যে তুমি র‍্যাকেটের প্রতি ক্রিকেট ব্যাটের মত ব্যবহার করছিলে এখন তা টের পাওয়া গেল।" এই বলে' সেই ছেলেটি একটু মুচকী হেসে, অশোকের সমস্ত জয়গৌরব ম্লান ক'রে দিয়ে চলে গেল।

এর ফলে অশোক তার হৃদয়ের দুর্বল স্থানে দারুণ আঘাৎ পেয়েছিল, বলাই বাহুল্য। র‍্যাকেটের প্রতি ব্যাটের মত ব্যবহার করা—দুর্ব্বব্যবহার করা ছাড়া আর কি ? ভগ্নহৃদয়ে সেই দণ্ডেই সে টেনিস খেলা ছেড়ে দিল চিরদিনের মতন।

এবং একটু আশান্বিত চিত্তে ফের সে ফিরে গেল ক্রিকেটে

তারপর। আর যাই হোক, র‍্যাকেটের দৌলতে, ব্যাট ধরবার কায়দাটা তো সে শিখতে পেরেছে—সেটাও বড় কম লাভ নয়। এবং ক্রিকেট খেলাতেও কি কোশের তুল্য বিখ্যাত কেউ নেই—যাঁরা কষে ব্যাট হাঁকড়ে পুনঃ পুনঃ সেঞ্চুরী ক'রে অমর হয়েছেন? তাঁদের একজনের সমকক্ষ হতে পারলেও তো হয়। তাইকি কিছু কম না কি? এবং তা কি সে হতে পারবে না কোন দিন? টেনিসে অনুযোগ লাভ করে' ফিরে এসে সে ক্রিকেটে যোগদান করল।

এবং এবারেও একাদিক্রমে কয়েকটা বাউণ্ডারি আর অসংখ্য রান তুলে ফেলবার পরে গেম্ মাষ্টার এগিয়ে এলেন। এসে বল্লেন, "অনর্থক তুমি খেলতে নেমেছ। ক্রিকেট তোমার দ্বারা হবার নয়। তোমার হাত দেখছি বিগড়েছে আরো। ঠিক টেনিস র‍্যাকেটের মতই তুমি ব্যাট ধরছ এখন। এবং এটা আগের চেয়েও খারাপ।

অশোক দমে গেল খুব। যতই না সে জিতুক, লোকে ঘাড় নাড়তে থাকে। বলে, ও কিছু না, কিছু হচ্ছে না। জিতলে কি হবে, ওর খেলায় কোনো ষ্টাইল নেই। আর ষ্টাইলই যদি না থাকল তাহলে আর খেলার থাকল কি?

এতদূর পর্যন্ত উল্লেখের পর অশোক আমার মুখের দিকে তাকালো—"এ বিষয়ে তোমার কি মত? ঐ লোকদের কথাই কি ঠিক না?"

আমি উক্ত লোকেদের উক্তিতে সায় দিতে বাধ্য হলাম। বল্লাম, "ঠিকই বলেছে ওরা। খেলায় হারজিত বড় নয়। এমন কি,

খেলাটাও কিছু না। খেলার চেয়ে খেলার কায়দাটাই হোলো আসল। সেইটাই বড় কথা। কায়দা ক'রে খেলে মোহন বাগান কতোবার তো হেরে গেছে, ছাখোনিকি? কিন্তু তাতে কি তার মাহাত্ম্য একটুও ক্ষুন্ন হয়েছে?...যাক্‌গে, তুমি কি তার পরে ক্রিকেট খেলা ছেড়ে দিলে একেবারে?"

"জন্মের মত।" বল্ল অশোক—"ন্যাড়া আবার কবার বেলতলায়, যায়?"

এর পরের বৃত্তান্তটাও শুনলাম অশোকের। সব শেষে, খেলা ধুলা সমস্ত ছেড়ে সে একটা কুস্তির আখড়ায় ভর্ত্তি হয়েছিল। দেহচর্চ্চার জন্য একটা কিছু করা চাই তো।

কিন্তু যেমনি সে মুগুর ভাঁজতে সুরু করেছে আখড়ার ওস্তাদ হাঁ হাঁ করে ছুটে এলেন—"ওকি হচ্ছে? করছ কি? মুগুরের অমন করে অপমান করছ কেন?"

অশোক ভাবল, ঘোরাবার মুখে মুগুরটা পায়ে ঠেকেছিল বলেই বোধহয় ঘাট হয়েছে। অম্‌নি সে ভয়ে ভয়ে মুগুরকে মাথায় ঠেকিয়ে প্রাণাম করল। মুগুরের পায়ে মাথা ঠুকতে বাধ্য হোলো, কি করবে? ওস্তাদের চেহারা মুগুরের চেয়েও গুরুতর ছিল কিনা!

কিন্তু তাতেও ওস্তাদজী শান্ত হবার নন্‌। তিনি কেবল আপ্‌সোস করেন—"এ কি রকম মুগুর ভাঁজা তোমার? এরকম তো কেউ মুগুর ভাঁজে না। তুমি কি কখনো ক্রিকেট খেলতে নাকি? ব্যাটের মতো মুগুরটাকে হাঁকড়াচ্ছো বলে' যেন বোধ হচ্ছে।"

এই কথা শুনে মুগুর ফেলে সেই যে অশোক সেখান থেকে দৌড় মেরেছে আর তাকে আখড়ার ত্রিসীমানাতেও কেউ ছাখেনি। এই তার খেলাধূলার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস,—এসব শুনে এর পরেও কি তাকে আমি ব্যাডমিন্‌টন্‌ খেল্‌তে বলি? সে আমায় প্রশ্ন করে। আমি হয়ত বল্‌তে পারি কিন্তু তার মোটেই আর সাহস হয় না। সে নিজেই নিজের উত্তর দিয়ে দেয়।

"খ্যালো না, ক্ষতি কি?" আমি প্রতুত্তরে বলি—"যতো খুসি তুমি ভুল খেলতে পার তাতে আমার কিছু যায় আসে না। এবং আমার কোন আপত্তি নেই। তুমি যদি খেলার দোষে হেরে যাও তাহলে আমি খুসিই হবো। হারাতে পারলে আমার ভারী আনন্দ হয়।"

আর কিছু না, কেবল আমাকে আনন্দদানের জন্যেই নিস্বার্থপর হয়ে অশোক খেলতে নামল। কিন্তু আনন্দ দেওয়া দূরে থাক' একটার পর একটা, ও নিজেই 'গেম্‌ আপ' করে চল্ল।

অল্প কিছুদিন খেলাটা ধরলেও, এর মধ্যেই বেশ আমি রপ্ত হয়েছিলাম বলে' ধারণা হয়েছিল, ও কিন্তু প্রথম নেমেই আমার সে ধারণা টলিয়ে দিতে থাকে।

পরের পর ওর কাছে পরাজয় লাভ করে' আত্মসম্বরণ করা কঠিন হয়ে উঠল আমার পক্ষে। আমি না বলে' আর পারলাম না—

"অশোক, তুমি খেলছ খ্যালো' কিন্তু এ কী রকম খেলা তোমার? ব্যাড্‌মিন্‌টন্‌ কি ওই রকম ক'রে খ্যালে? এ যদি ব্যাড্‌মিন্‌টন্‌ হয় তাহলে ওয়াস্‌মিন্‌টন্‌ কাকে বলে আমি জানিনে

এমন কি তোমার খেলাকে ওয়ার্স্‌ট্‌ মিনটন্‌ বললেও অত্যুক্তি হয় না।”

“কেন’ আমার কী হোলো ভাই? আমি জিতেছি তো।”—ও কাঁচুমাচু হয়ে বল্‌ল্‌।

“ওটাই তো তোমার মহদ্দোষ। বেতালা খেলেও জিতে যাচ্ছ, তাতেই তো রাগ হচ্ছে আরো। র‍্যাকেট্‌টাকে, মনে হচ্ছে’ যেন ঠিক মুগুরের তুমি ভ াঁজতে লেগেছো।”—বলি আমি।

যেই না বলা, আর মুগুরের কথা যেই না কানে যাওয়া ওর র‍্যাকেট ফেলে কানে আঙুল দিয়ে সেই যে অশোক আমার কাছ থেকে উধাও হয়ে গেছে আর তার কোন পাত্তা পাই নি।

নরহরির স্যাঙাত্

টেলিফোন্‌টা ঝন্‌ঝনিয়ে উঠ্‌ল পাশের ঘরে। সবে মাত্র ভোর তখন,—বিছানা ছেড়ে উঠ্‌তে তখনো আমার বেশ খানিক দেরি। তার ওপরে কাল রাত্রে এক নেমন্তন্নে বেজায় খাওয়াদাওয়া হয়েছিল, বেশিই একটু, তখনো তার রেশ কাটেনি। সেই অসভ্য সময়ে টেলিফোনের ডাকে লেপের মায়া কাটিয়ে উঠতে হোলো।

"হ্যালো!" কণ্ঠস্বরটা একটু কড়াই হয়ে গেল বুঝি।

"হ্যা—লো"! নরহরির গলা কানে এলো। মিঠে হয়ে আর মোলায়েম হয়ে।

নরহরি উঠেচে এত সকালে! তাজ্জব্! কাল রাত্রে নেমন্তন্ন-বাড়ী এত বেশী ও খেয়েছিল যে নড়াচড়ার শক্তি ছিল না ওর। নড়ানো চড়ানোও শক্ত ছিল ওকে। পাতা থেকে তোল্লাতুল্লি করে' ওকে রিক্‌সয় ওঠানো হয়েছিল—এবং রিকস্ থেকে এক রকম ধরে বেঁধে, যেমন করে' ক্রেন্ দিয়ে মাল তোলে তেমনি করে' ওর বাড়ীতে ওকে তুল্‌তে হয়েছে।

"ওহে শোনো!" বল্লে নরহরি—"এক বন্ধুকে আমি পাঠাচ্ছিলাম তোমার কাছে—তোমার সঙ্গে প্রাতরাশ করতে।"

"কার বন্ধু?"—ঘুমের জড়তা ভালো ক'রে তখনো আমার কাটে নি।

"আমার—আবার কার? হরেকৃষ্ণ পতিতুণ্ডি, মোকাম জব্বলপুর। আজ সকালের গাড়ীতে পশ্চিম থেকে তাঁর পৌঁছবার কথা। এই এসে পড়্‌লেন বলে'। আমাকে তো ভাই

বিশেষ জরুরি কাজে একটু বর্দ্ধমানে যেতে হচ্ছে—এক্ষুনিই—কখন্ ফিরব—এমন কি কবে ফিরব তার স্থিরতা নেই। তোমার ওপরেই তাঁর দেখাশোনার ভার দিয়ে যেতে চাই। তোমার মত বন্ধু আমার আর কে আছে বলো?"

"দাঁড়াও দাঁড়াও। আমাকেও যে—" আমারো যে গন্তব্য স্থল ছিল একটা, সুদূরতরই ছিল আরো, কিন্ত চট্ করে' সেটা আর মনে আসতে চায় না। আর সেই ফাঁকে নরহরি বাধা দিয়ে বলে' ওঠে—"জিওমেট্রি পড়েচ ত? মনে আছে নিশ্চয়? এ ফেণ্ড হু ইজ এ ফ্রেণ্ড টুআদার্ ফ্রেণ্ড্ আর্ অল্ ইকোয়ল্ টু ওয়ান্ অ্যানাদার। অ্যাংগল্ ট্যাংগল্ দিয়ে ওই রকম কী একটা বলে না জিওমেট্রিতে? সে হিসেবে হরেকেষ্টকে তোমার আপন বন্ধু বলেও গণ্য করতে পারো। আমার আপত্তি নেই।"

কিন্তু আমার আপত্তি ছিল। কিন্তু সে কথা ভাষায় প্রকাশ করার আগেই নরহরি চেঁচাতে থাকে—"ভালো কথা, তোমাকে জানানো দরকার। আমার বন্ধুটি হচ্ছেন পাক্কা নিরামিষাশী—এক নম্বরের গোঁড়া যাকে বলে। তাঁর পাতের গোড়ায় আমিষ কোনো দ্রব্য দেয়া দূরে থাক্—মাছ মাংসের কথাই তাঁর কাছে তুলো না। ভয়ঙ্কর প্রাণে আঘাত পাবেন তাহলে। আর হ্যাঁ, দেখা শোনার ভারই কেবল নয়, দেখানোর শোনানোর ভারও থাক্‌লো তোমার ওপর। কলকাতার যা কিছু দ্রষ্টব্য আর জ্ঞাতব্য আছে—যে ক'দিন তোমার ওখানে থাকেন, থাক্‌তে চান্ স্বেচ্ছায়, সেই সব দেখিয়ে শুনিয়ে এখানে ওখানে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে

বেড়াতে দ্বিধা কোরো না। আচ্ছা, আসি। ট্রেন ধরার সময় হয়ে এল আমার। তাঁর ট্রেন আর আমার ট্রেন এক সঙ্গেই ধরতে হবে কিনা! হাওড়ার প্ল্যাটফর্ম থেকেই তাঁকে তোমার ঠিকানায় রিডিরেক্ট্ করে' দিয়ে তবে আমার বর্দ্ধমানের গাড়ী ধরা। আচ্ছা আসি। কিছু মনে কোরো না ভাই।"

মনে কত কিছুই না করি, না ক'রে পারি না। মনের কোনো দোষ নেই, বন্ধুর মন হলেও মানুষের মন তো! সামনে পেলে নরহরিকে চিবিয়ে খাবার ইচ্ছাও মনে হয়। আগের রাত্রের ওই ভুরিভোজনের পর কারো বন্ধুর সঙ্গে অত সকালে প্রাতরাশ করতে আদৌ আমার মেজাজ ছিল না, কিন্তু নরহরিকে পালটা টেলিফোন করতে গিয়ে আর তার পাত্তা নেই। অগত্যা চট পট্ হাতমুখ ধুয়ে, প্রাতঃকৃত সেরে, কাপড় চোপড় বদ্‌লে তৈরী হয়ে পড়তে হোলো। হরেকেষ্ট বাবু কখন্ এসে পড়েন বলা যায়না; হয়তো সূর্য্যের আগেই তাঁর উদয় হবে পশ্চিম দিক থেকে।

এবং কেবল প্রাতরাশই নয়। সারাদিন ধরেই কলকাতার চারধারে তাঁর সঙ্গে রাসলীলা ক'রে বেড়াতে হবে। আর ট্রামে বাসেও আজকাল যা রাশ্ তা কহতব্য নয়। পদব্রজে ব্রজলীলা করতে হলেই আমার হয়েছে!

বিষাক্ত মনে এই সব ভাবছি এমন সময় সদর দরজার কড়া-আওয়াজ কানে এল। দৌড়ে গিয়ে কপাট্ খুলতেই নরহরির বন্ধু ভজহরি—আই মীন্—হরেকেষ্টকে দ্বারদেশে দণ্ডায়মান দেখলাম। জাব্বাজোব্বা আঁটা, জব্বলপুরের আম্‌দানি—দেখ্‌লেই বোঝা যায়।

"আপনি ?...ও আপনিই !" ভদ্রলোকের গদ্‌গদ কণ্ঠ—"কী বলে যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাব জানিনা। আপনি আমার রক্ষণাবেক্ষণের ভার নিয়ে যে কী বিপদ থেকে আমায় বাঁচিয়েছেন কী বল্‌ব। নরুটা কী এক তাড়ায় কোথায় যেন চলে গেল—কবে ফিরবে কে জানে !"

"যাক্‌ গে, যেতে দিন্‌। আপনি আমাকেই আপনার নরুর তুল্য বিবেচনা করবেন। নরু আদৌ না ফিরলেও আমার কোনো দুঃখ নেই। বরং আর সে না ফিরুক ! আপদ গেলেই বাঁচি !... তবে আপনাকে দেখে আমার যে কী আনন্দ হচ্ছে, কী বল্‌ব ! দয়া ক'রে পায়ের ধূলো দিয়ে ভেতরে আসুন, আপনার প্রাতরাশ প্রস্তুত। একটু জলযোগ করে' নিন আগে। আপনি চা খান্‌ তো—চা না কফি না কোকো ? কী ?"

"স্রেফ্‌ দুধ !" বলতে গিয়ে ভদ্রলোককে যেন একটু দ্বিধান্বিত দেখা গেল—"মানে প্রাতরাশের কথাই বল্‌ছি। নইলে অন্য অন্য সময়ে অন্যান্য জিনিষ খাই।" ঢোঁক গিলে তিনি বল্লেন।

"আজ্ঞে, আমিও তাই। দুধের দ্বারাই আমার প্রাতঃকালীন জলযোগ। দুধের মতো জিনিষ আছে ? মানে, জলীয় জিনিষ।"

চাকরকে ডেকে বলে দিলাম—পোচ নয়, ওম্‌লেট্‌ নয়, মাছ ভাজা নয়—শুদ্ধু দু গ্লাস দুধ—চা ফা কিছু না। টোস্‌ট্‌ ? টোস্‌ট কি আমিষ বস্তুর মধ্যে ধর্ত্তব্য ? কে জানে, কাজ নেই ! সন্দেহবশে টোস্‌ট্‌ও বাদ দেওয়া গেল। অকারণে কারো প্রাণে আঘাত দিতে আমার ভালো লাগে না।

দুধের গ্লাস নিঃশেষ করে হরেকেষ্টবাবু বিচ্ছিরি এক ঢেঁকুর তুললেন। এক নিঃশ্বাসে যেমন কোঁৎ কোঁৎ করে' সবটা গিলে ফেল্লেন দেখলে অবাক্ হতে হয়। কেবল নিরামষাশী বল্লে এঁকে কম করে' বলা হয়, কিছুই বলা হয় না,—আসলে ইনি ঘোর নিরামিষাসক্ত।

কিন্তু আমি তো আর অতটা শক্ত নই, অমন শক্তি রাখিনে, কাজেই, পাঁচন যেমন করে' গেলে মানুষ, তেম্নি করে' একটু-একটু করে' এক আধ ঢোঁক্ গিলছি, এত কায়ক্লেশে যে কী বলব!

"আপনি সত্যিই একজন নিরামিষের ভক্ত বটে, স্বচক্ষেই তো দেখতে পাচ্ছি! এযুগে এরকম্টি দেখতে পাব, কোথাও যে এ জাতীয় কেউ এখনো কেউ টিকে আছে তা আমার আশা ছিল না। কিন্তু না—দেখলে আনন্দ হয়! যেমন করে' রসিয়ে অমৃতের মত এক এক চুমুক মারছেন—নাঃ, সত্যি আপনি দুগ্ধরসিক বটে!" হরেকেষ্টবাবু বিগলিত হয়ে বল্লেন।

উচ্চ প্রশংসালাভ করে' দুধে বিতৃষ্ণা আমার আরো যেন বেড়ে গেল। পেটের ভেতরে কাল্কের রাতের মাংসেরা "ব্য ব্যা—অর্র্র্ধ্র্র্—কোক্কোর কোঁ!" নিজের নিজের জাতীয় ভাষায় আলাপ লাগিয়ে দিয়েছে মনে হলো। আমি গেলাস নামিয়ে রাখলাম।

"দুধ খায় বাছুরে! আরেকটা বিচ্ছিরি ঢেঁকুর তুলে মুখ বিকৃত করলেন হরেকেষ্টবাবু।

"য়্যাঁ?" আমার চমক লাগল হঠাৎ।

"না, না। আমি আপনাকে মীন্ করিনি। আপনার প্রতি কটাক্ষ করে' কিছু বল্ছিনে।" তাড়াতাড়ি বলে উঠ্লেন তিনি—

'আসলে গোরুর দুধ তার নিজের বাছুরের জন্যেই সৃষ্টি তো? তাই নয় কি? সেই কথাই আমি বল্‌ছিলাম।"

"তা যা বলেন। আপনার আসার আগেই আমার আরেক গ্লাস হয়ে গেছে কিনা, পেটে আর জায়গা নেই।" এই বলে' বাকি দুধের দিকে আমি আর দৃকপাত করিনে, গেলাস ছুঁইনে আর।"

"আহা খেলেন না! যতটুকু দুধ ততটুকুই রক্ত যে! তাঁর আক্ষেপ হতে থাকে।"

"রক্ত জলকরা। কলকাতার দুধ কিনা।" আমি বলি। "রক্ত একেবারে জলবৎ—না খেলেও তেমন ক্ষতি নেই।"

দুগ্ধগ্রাস থেকে মুক্তি লাভ করে' আমরা বেরিয়ে পড়লাম। কলকাতার রাস্তার ইতোনষ্টস্ততোভ্রষ্ট হয়ে বেড়াতে লাগলাম। পথে-বিপথে চার দিকেই কতো রেস্তোরাঁ কাফে আর কেবিন্—কিন্তু সবখানেই তো মৎস্য-মাংসঘটিত ব্যাপার—কোথাও পা দেবার যো নেই। তার ওপরে নিরামিষ আহারের উপকারিতার বিষয়ে হরেকৃষ্ণবাবুর বক্তৃতা শুনতে শুনতে চলেছি।

অগত্যা তাঁর সহানুভূতি আকর্ষণ করতে আমিষ-আহারের বিষময় ফল নিয়ে আমিও কিছু কিছু বল্লাম। আমিষ হজম করতে যে পরিমাণ শক্তি যায় ঐ খাদ্য হতে সে পরিমাণ শক্তি আসে না, তার ফলে আমিষাশীরা অল্প দিনে মারা পড়েন। এক কথায় আমিষ খাওয়া আর খাবি খাওয়া এক। (অবিশ্যি, নিরামিষাশীরা বহুকাল বেঁচে থাকেন, কিন্তু মাছ মাংস ছেড়ে দিয়ে কিসের আশাতেই বা তাঁরা বাঁচেন? কোন্ সুখেই বা, আমি তাই ভাবি!)

কিন্তু মুস্কিল হোলো খাওয়া নিয়ে। কী যে তাঁকে খাওয়ানো যায় আর কোথায় বা খাওয়াবো! সত্যি, কোথায় যে খাওয়া দাওয়া করি! মৎস্য-মাংসবিবর্জ্জিত একটাও পাকস্থল তো (না কি, পাকস্থলী?) কলকাতায় নেই—অন্ততঃ জানাশোনার মধ্যে নেই। কোথায় আমাদের নিয়ে যাই?

অবশেষে, ভেবে দেখলাম ফলমূলই প্রশস্ত। মুল কোথায় মেলে জানিনা, মূলোর বাজারেই হয়তো বা, কিন্তু ফল তো সর্ব্বত্র। প্রায় সব রাস্তার মোড়েই ফিরিওয়ালার হেপাজতে ছড়ানো রয়েছে ফল। ছড়ানো এবং ছাড়ানো—বাতাবি নেবু, কমলা, কলা আর পেঁপে। আনারসেরও অভাব নেই! পয়সা ফেল্লেই পাওয়া যায়। তাই খাওয়া যেতে লাগল। হর্‌দম্—যখন তখন—দুজনে মিলে।

সারা দুপুরটা এইভাবে ফলবান হয়ে—লক্ষ্মণ আর গাছপালার মত বারম্বার ফল ধরতে বাধ্য হয়ে বিকেলের দিকে হরেকেষ্টকে একটু যেন ব্যাজার দেখা গেল। 'ফল খায় বাঁদরে' এই ধরণের একটা মন্তব্যও যেন ফস্‌কে এল তাঁর মুখ থেকে। অবিশ্যি, সঙ্গে সঙ্গে তিনি শুদ্ধিপত্রে প্রকাশ করে' দিলেন—আমাদের নিজেদের প্রতি কোনো অবজ্ঞা তিনি দেখাচ্ছেন না। আসলে, ফল তো গাছেই ফলে, আর বাঁদরদেরও গাছেই বসবাস তো—কাজেই প্রথম ফলাওয়ের মুখে তাদের বরাতেই ফললাভ ঘটে থাকে।

আমি বল্লুম—"মা ফলেষু কদাচন। তাহলে আর ফলার করে' কাজ নেই। খুব হয়েছে।" মনে মনেই বল্লুম যদিও।

এখন বৈকালিক জলযোগ কি করা যায়? এক পাঞ্জাবীর

দোকানে গিয়ে দু গ্লাস—বেশ বড় বড় দুগ্লাস—লস্যি নেওয়া গেল। সেই ঘোল না খেয়ে হরেকেষ্টবাবু ঘাল্ হয়ে পড়লেন। অনেকক্ষণ পরে দম নিয়ে তিনি বল্লেন—"ঘোল খায় যতো বোকায়।" বলে' তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেল্লেন।

"কেন, খেতে কি ভালো না? আমার তো খাসা লাগ্‌লো।"

"খাসা বইকি! খুবই চমৎকার! খেয়ে খুব তৃপ্তি পেয়েছি, তা বলাই বাহুল্য। আমাদের আমি বোকা বল্‌ছি তা ভাববেন না। বোকারা ঘোল খায় বলে' একটা কথা ছিল না? কথাটার মানে কী, তাই আমি ভাবছিলাম।"

দুধের যত প্রকার অপভ্রংশ হতে পারে তার মধ্যে ঘোলটাই যে একমাত্র নয়—তা ছাড়া ছাতার বাঁট্‌ও আছে—তবে ঘোলটাই সবচেয়ে অম্লমধুর আর বেশ সুস্বাদুও—বৈজ্ঞানিকের মতো আমি তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করি। দুধের ছানা-অংশ থেকে ছাতার বাঁট্ হয়ে থাকে একথা শুনে হরেকেষ্টবাবু তো হাঁ হয়ে গেলেন। বল্লেন, "ছাতার বাঁট কিন্তু তেমন সুস্বাদু নয়। আমি শিশুকালে খেয়েছি মশাই, এখনো আমার মনে আছে।"

"অবশ্যি, ঘোল যেমন পেটে লাগে ছাতার বাঁট্ তেমন নয়। ওকে বরং পিঠে লাগানো যায়।" আমি অনুযোগ করি। এবং পরবর্ত্তী সুযোগে নরহরি আর ছাতার বাঁটকে দ্বন্দ্বসমাসে নিয়ে আসা যায় কিনা মনে মনে ভাবি।

সমস্ত দর্শন-প্রদর্শন সমাধা করতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। ক্লান্ত হয়ে পড়লাম আমি। হরেকেষ্ট·বল্লেন আর একটা জায়গা দেখলেই

তাঁর হয়ে যায়। গুলুওস্তাগরের গলির যে বাড়ীর একতলায় তিনি জন্মেছিলেন সেইখানটা।

তাঁর সেই সাধটাই বা না মেটে কেন? ঠিকানা বাৎলে সেই জন্মস্থানে তাঁকে নিয়ে গেলাম। খুব বেশি খোঁজাখুঁজি করতে হোলোনা। কিন্তু জায়গাটা দেখে হরেকেষ্টবাবু অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়লেন। সেই একতলাটা এখন একটা চপ কাট্‌লেটের দোকানে পরিণত হয়েছে দেখা গেল।

"ভেতরে গিয়ে দেখবার ইচ্ছা ছিল একবার; কিন্তু—কি দুঃখের বিষয়—" ভগ্নকণ্ঠে তিনি উচ্চারণ করলেন।

"আসুন না, যাওয়া যাক্। দেখতে দোষ কি? না খেলেই হোলো।"

ভেতরে গেলাম আমরা এবং একটা টেবিল নিয়ে বসলাম—ঠিক যেখানটিতে হরেকেষ্টবাবু স্বর্গচ্যুত হয়ে ইহলোকে প্রথম পদার্পণ করেছিলেন সেইখানে। দুটো লেমোনেড্ নিয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করা গেল।

কেবল চপ কাটলেটই নয়, সব কিছুই ছিল হোটেলটায়। মাংসের কারি, কোর্ম্মা, রোস্‌ট, কাবাব, দোপেঁয়াজী, পোলাও পর্য্যন্ত। আর এমন খাসা গন্ধ ছেড়েছিল!

সেই গন্ধে তো আমার জিভে জল এসে গেল। আর হরেকেষ্টবাবুর (সেই গন্ধেই কিনা বলতে পারি না) চোখ লাগল চক্ চক্ করতে।

"কেন যে মানুষ এই সব ছাইপাঁশ খায়—এই যতো চপ্

কাট্‌লেট্‌। খেয়ে কী সুখ পায় জানিনে।" বল্লেন হরেকেষ্ট: "কি রকম খেতে কে জানে।"

"একটা নিয়ে চেখে দেখা যাক্ না কেন?" আমি বলি। বাস্তবিক, অভিজ্ঞতা-অর্জ্জনে দোষ কি? সব রকমের অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করতে হয়। আসক্ত হয়ে না পড়লেই হোলো।"—সেকথাও আমি বলি।

"আচ্ছা বেশ, অভিজ্ঞতা লাভের জন্য সামান্য কিছু খেয়ে দেখা যাক্ না হয়। একটা চপ্ আর কাট্‌লেট্‌—কি বলেন?" নিম্‌রাজি হলেন হরেকেষ্ট।

"নিশ্চয় নিশ্চয়? আরো গোটা দুই বেশি ক'রে নেয়া যাক্— আমিই বা কেন অভিজ্ঞতায় বঞ্চিত হই?" আমি সায় দিয়ে বল্লাম।

চপ্ কাট্‌লেট্‌ এসে পড়ল। হরেকেষ্ট বল্লেন—"ও জিনিষ আর হাত দিয়ে ছুঁতে চাইনে। ছুরি কাঁটা আছে?" ছুরি কাঁটাও এসে গেল। দুপ্রস্থই এল। দুজনেই আমরা অভিজ্ঞ হতে লাগলাম।

ওঁর ছুরি-কাটা-চালানোর কায়দা দেখে তো আমার তাক লেগে গেল। অবশেষে না ব'লে আর পারলাম না—"কিছু মনে করবেন না হরেকেষ্টবাবু, নরহরির কথায় কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে। ঘোরতর সন্দেহ। সে আমাকে বল্ল যে আপনি নাকি মাছ মাংস স্পর্শও করেন না, কিন্তু ছুরি কাঁটায় আপনাকে যেরকম ওস্তাদ্ দেখছি—"

"নরহরি বল্ল?" হরেকেষ্টবাবু বাধা দিয়ে বল্লেন সবিস্ময়ে,

"নরহরি বল্ল এইকথা? আমি মাছ মাংস ছুঁইনে বল্ল সে? বরং মাছ মাংস ছাড়া আর কিছুই আমি ছুঁইনে। আপনিই নাকি নিরামিষের ভীষণ ভক্ত নরহরি আমায় বলেছে। আর বলেছে যে মাছ মাংসের কথা কানে তুল্‌তেও প্রাণে আপনি ব্যাথা পান। তা কি তবে সত্যি নয়—য়ঁ্যা?"

আর য়ঁ্যা! তারপরে দুজনে মিলে নরহরির যা একখানা শ্রাদ্ধ করা গেল। প্রাণ খুলেই করলাম। শ্রাদ্ধশান্তি সেরে তখন একধার থেকে চপ্‌কাট্‌লেট্‌, রোসট্‌, কারি, কাবাব, কোর্মা, দোপেঁয়াজী, মাছের পোলাও, মাংসের পোলাও যা কিছু ছিল সেই হোটেলে, সব সেই টেবিলে এসো জড়ো হোলো। শ্রাদ্ধের পরে নিয়মভঙ্গে লাগা গেল প্রাণপণে।

এবং তারপরে? খাওয়া দাওয়া শেষ হলে নরুর বন্ধু হরুকেও তোল্লাতুল্লি ক'রে রিক্‌সয় টেনে তুল্‌তে হোলো। ঠিক আগের রাতের নরহরির মতই।

আমাকেই টানাটানি করতে হোলো—আমার অদৃষ্ট! গুরু ভোজনের পরে গুরুতর পরিশ্রম আমার পোষায় না—কিন্তু করব কি? পতিতুণ্ডি মশাইকে তো গুলু ওস্তাগরের হোটেলে ফেলে আসা যায় না অধঃপতিত অবস্থায়? নরহরি, যে আমার বন্ধু আর ইনি, যিনি, নরহরির বন্ধু—ফলতঃ, উনি আর আমি এবং আমরা সবাই পরস্পর সমান এবং বন্ধুবৎ নই কি? জিওমেট্রিতে কি বলে? য়ঁ্যা?—

আর কিছু না, বন্ধুকে উদ্দেশ্যে ক'রে বলেচি খালি—"চা খাও আর না খাও, আমাকে তো চাখাও।"

অম্‌নি দোকানের ও-কোণ থেকে কে যেন তার কাণ খাড়া কর্‌ল, ছোট্ট একটি ছেলে, আমি লক্ষ্য করলাম।

"দূর! এই অবেলায় এখন চা খায়? শুদ্ধু এক গ্লাস জল—আর কিছু না!" বন্ধুর জবাব এলো—"আর—আর না হয় ওই সঙ্গে একখানা বিস্কুট্। ভাগাভাগি করেই অবিশ্যি।"

"ভারী যে নিরাসক্তি! না বাপু, আধখানা বিস্কুটে আমার লোভ নেই, আর নীরেও আমার আসক্তি নেই তুমি জানো। আমার চা-ই চাই!"

কান-খাড়া-করা ছেলেটি এবার ব'লে উঠ্‌ল—"য়্যাঁ, কি বল্লেন?"

"তোমাকে তো কিছু বলিনি ভাই!" আমি বল্লাম—"আমি বক্‌চি এই—এই পাশের—আমার পাশের কী বল্‌ব একে? এই পার্শ্ববর্ত্তীকে।"

"আপনি শিব্রাম্ চকর্‌বরতির মতো কথা বল্লেন না?"

"য়্যাঁ? কার মতো কথা বল্লাম?" আমার বেশ চমক্ লাগে।

"শিব্রাম চকর্‌বরতির মতো।"

এবারে আমি হকচকিয়েই গেছি! বারে! আমি আবার কার মতো কথা বলতে যাব? আমি কি—বল্‌তে কি—আমি নিজেই কি উক্ত অভদ্রলোক—সেই শিব্রাম চকর্‌বরতি নই?

"ওই রকম মিলিয়ে-মিলিয়ে ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে ল্যাজামুড়ো এক ক'রে কথা বলা ভারী খারাপ! ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক। বুঝলেন মশাই?"

"তুমি কি—ঐ কি নাম বল্লে—সেই ভদ্রলোককে কখনো দেখেচ?"

"না দেখিনি, দেখবার আমার বাসনাও নেই। ঐ ভদ্রলোক আমাকে যা বিপদে ফেলেছিলেন একবার।"

"য়্যাঁ, বলো কি? তোমাকে তিনি বিপদে ফেলেছিলেন?" আমি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ওকে পর্যবেক্ষণ করি—"কই, আমার তো তা মনে পড়চে না!"

"উনি কি আর ফেলেছিলেন? ওঁর মতো কথা বল্‌তে গিয়ে আমি নিজেই ভীষণ বিপদে পড়েছিলাম!" ছেলেটি বল্ল—"হাড় কখানা আস্ত নিয়ে যে নিজের আস্তানায় ফির্‌তে পেরেছি এই ঢের!"

"ও, বুঝেচি! সেই তারা, সেই সব বিচ্ছিরি লোক, শিব্রাম চকর্‌বরতির লেখা যারা একদম্ পছন্দ করে না, তারাই বুঝি? তারা তোমার কথা শুনে, তোমাকেই শিব্রাম চকর্‌বরতি ভেবে, সবাই মিলে, ধরে বেঁধে বেশ এক বেধড়ক্—"

"উঁহুহু!" ছেলেটি বাধা দেয়—"তারা কেন মারবে? তারা

কারা? তারা কোথেকে এল? না, তারা নয়। সেই জন্যেই তো বারণ করচি, শিব্রাম চকর্‌বরত্তির মতো কথা কক্ষণো বল্‌বেন না। ওই ধরণের কথা বলার বদভ্যাস ছাড়ুন, জন্মের মত ছেড়ে দিন্—তা নাহলে আপনাকেও হয়তো কোন্‌দিন আমার মতো বিপদে পড়তে হবে।"

বন্ধুর উদ্দেশে বল্লাম—"তাহলে চা থাক্। খোকার গল্পটাই শোনা যাক্! বলো তো ভাই, কাণ্ডটা। ওই বিষয়ে বল্‌তে কি, সব চেয়ে বেশী আমারই আগে সাবধান হওয়া দরকার।"

এবং আমার বন্ধু—যিনি এতক্ষণ চায়ের বিপক্ষে ছিলেন—চাউর করলেন—

"না, চা আসুক্। এবং তুমিও এসো এই টেবিলে। ওহে তিন কাপ্ চা, আর—আর তিন ডজন বিস্কুট্! চা খাই আর না খাই, তোমাদের তো—কি বলে গিয়ে—চা পান করাতে দোষ নেই?"

"খুব সাম্‌লে নিয়েছেন।" ছেলেটি আমাদের টেবিলে এসে বস্‌ল—"বল্‌তে পার্‌তেন যে ঐটেই দস্তুর!—ঐ সঙ্গে বল্‌তে পারতেন আরো। কিন্তু খুব বাঁচিয়ে নিয়েছেন। শিব্রাম্ চকর্‌বরত্তি এখানে থাক্‌লে, ঐ দোষের জন্যে, দস্তুকেও নিয়াস্‌তেন বিনা দোষেই। ঐটেই ওঁর মস্ত দোষ। টেনে হিঁচ্‌ড়ে কেমন ক'রে যে তিনি এনে ফ্যালেন।"

"কি ক'রে যে এত পারেন ভদ্রলোক, আমি আশ্চর্য্য হই।" আশ্চর্য্য হয়ে আমি বলি।

"যেমন ক'রে মুর্গিতে ডিম পাড়ে, তেম্‌নি আর কি!" বন্ধুবরের অনুযোগ—"এমন কি শক্ত?"

"শক্ত? কিছু না।" ছেলেটি বলে—"আমরা সব্বাই পারি। আমাদের ক্লাসের পেত্যেক ছেলে। আমাদের বাড়ীতে দাদারা, দিদিরা, এমন কি বৌদি পর্য্যন্ত। ওতো এন্‌তার পারা যায়, ঐ উনি যা বল্লেন—একেবারে মুর্গির মতন। আস্ত ঘোড়ার ডিম। পেড়ে দিলেই হোলো—পারতেন কি! তবে লেখকের মধ্যে ঐ একজনই শুধু পারেন—কিন্তু পাঠকের মধ্যে হাজার হাজার। পাঠকের মধ্যে এক আমিই যা ঠেকে শিখেছি, আমি আর পারব না।" এই ব'লে ছেলেটি নিজের অক্ষমতা জ্ঞাপন করে।

এরপর, আসল গল্পটা যতদূর সম্ভব ছেলেটির নিজের ভাষায় বলার চেষ্টা করা যাক্—

"গরমের ছুটিটা কোথায় কাটান যায়! ভাব্‌লুম, অনেক দিন তো যাইনি, কাকার ওখানেই যাই—" ছেলেটি স্বুরু কর্‌ল বল্‌তে—'আসান্‌সোলে গিয়ে সোলে শান্‌ দিয়ে আসি। কলকাতার বাইরে ফাঁকাও হবে, আর আরাম ক'রে থাকাও হবে। একেবারে আমের আশা-যে ছিল না তাও না, তবে—না মশাই, আমার আমাশা ছিল না। তবে কাকার বাগানে ঢুকে আম জাম যে বাগানো যাবে সে আশা খুবই ছিল।...."

ছেলেটি অম্লানবদনে অকাতরে বলে যাচ্ছিল, আর আমার চোখ ক্রমশই বড়ো থেকে আরো বড়ো হতে হতে, ছানাবড়া কি,

লেডিকেনি পর্য্যন্ত ছাড়িয়ে গেল। অবশেষে আমি আর থাক্‌তে পার্‌লাম না—

"থামো থামো। তুমি বলচ্‌ কি? তুমি কি বলচ্‌, তুমি শিব্রাম চকর্‌বরতি নও? তুমি নিজেই নও? ঠিক বল্‌চ? ঠিক জানো? আমার গুরুতর সন্দেহ হচ্ছে, তুমিই শিব্রাম্‌ চকরবরতি?"

"আমি? আমি না।" ছেলেটি ম্লান একটুখানি হাসল।

"বলো' নির্ভয়ে বলো, কোনো ভয় নেই। লোকটার ওপর রাগ আছে, কিন্তু আমরা তোমাকে ধরে ঠ্যাঙাব না।" আমার বন্ধুটি অভয় দিয়ে বলেন—"না, এমন সামনে পেয়ে বাগে পেলেও না।"

"কী যে বলেন! শিব্রাম চকরবরতি-লোকটি কি এতই ছোট হবে?" এই ব'লে ছেলেটি আত্মরক্ষার খাতিরেই কিনা বলা যায় না, অদূরবর্ত্তী আয়নায় প্রতিফলিত নিজের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ কর্‌ল—চেয়ে দেখুন তো! আর শিব্রাম চকর বরতির নাকি গোঁফ-দাড়ি একদম্‌ থাক্‌বে না?"

"সে একটা কথা বটে।" আমি ঘাড় নাড়ি—"শিব্রাম চকর্‌বরতি লোকটা এত ছোট না হওয়াই উচিত। এতদিনে তো সাবালক হবার কথা! তবে কিনা, ছোট লোকের পক্ষে কিছুই অসম্ভব নয়। তা ছাড়া, তা ছাড়া"—আমি সন্দিগ্ধ হয়ে উঠি—"তুমি ঠিক ছদ্মবেশে আসো নি তো? মানে কিনা,—ভদ্র ভাষায় বল্‌তে হলে—আপনি ছদ্মবেশে আসেন নি তো শিব্রাম বাবু?"

ছেলেটি মুখ ভার ক'রে ভাবতে লাগল, বোধহয় তার ধরা-

পড়ে যাওয়া ছদ্মবেশের কথাই সে ভাবতে লাগল। আমিও ভাব্‌তে থাকি, ঐ শিব্রাম-হতভাগাটিকে অনমুকরণীয় বলেই আমার ধারণা ছিল। একটু অহঙ্কারও না ছিল তা নয়! অনমুকরণীয়, মানে অনুকরণের অযোগ্য। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, ওর সম্বন্ধে আমার, অনেকের মতো আমারও একটা ধারণাই এতদিন থেকে গেছে! অত্যন্ত সহজেই যে-কেউ ওকে—মানে, ঐ-শিব্রামটাকে—টেক্কার পর টেক্কা মেরে বেটক্কর যেতে পারে। তবে আর কষ্ট ক'রে ওর লেখা পড়া কেন? ছোঃ! অন্তত: আমি তো আর পড়ছিনে; ওর আজে-বাজে যতো বই, আজ থেকে সব তালাক্‌ দিলাম, তালাবন্ধ থাকলো বাক্সে!

"আপনি বল্‌ছেন আমিই সেই?" ছেলেটি আরো একটু ম্লান হাসল। "ছদ্মবেশে এসেছি বলে আপনাদের মনে হচ্ছে? বেশ, তাহলে আমার নাক কান টেনে টেনে দেখুন দেখ্‌তে পারেন টানা টানি ক'রে। মুখোস হলে তো খুলে আস্‌বে?"

ছেলেটি তার মুখ বাড়িয়ে দিল। আমার হাত সুড় সুড় করলেও আত্মসম্বরণ করে বল্‌লাম—"আচ্ছা পরে পরীক্ষা ক'রে দেখব'খন! এখন তোমার গল্প তো শেষ করো!"

আরম্ভ করল ছেলেটি—

"গেছিতো কাকার বাড়ি। নিরাপদে পৌঁছেচি। কাকা তখন বেদানা খাচ্ছিলেন, কোনো জ্বরজারি হয়নি, এমনিই সুস্থ শরীরে বেদানা দিয়ে ব্রেক্‌ ফার্সট করছেন, দেখেই বুঝ্‌তে পারলাম।

আমি যেতেই বল্লেন, 'এইযে, এইযে! মণ্টু যে! খবর কি? আছিস্ কেমন?

"খবর ভালো। সামার্ ভেকেশন আমার কি না! ভাবলুম, আসানসোল এসে সোলে একটু—,

কাকাবাবু বাধা দিয়ে বল্লেন—"বেশ বেশ! এসেছিস্ বেশ করেছিস্। যখন পাবি তখনই আসবি। কাকা কাকির বাড়ী সবাই আসে। আসে না কে?"

"ডাকাডকি না করেই তো আসে।" ঐ সঙ্গে এইটুকুও যদি যোগ করতেন কাকাবাবু, ভারী খুসী হতাম। কিন্তু কাকাবাবু ওর বেশী আর এগুলেন না, অধিক বলা বাহুল্য মাত্র ভেবে চেপে গেলেন একবারে। বোধহয় শিব্রাম্ চকর্বরতির বই ওঁর তেমন পড়া টড়া ছিলনা।

পায়ে ধুলো নিতে না নিতেই তিনি গলে পড়লেন—"এই নে! বেদানা খা।"

বেদানার অনুরোধে বেশ দমে গেলাম। ও-জিনিষ অসুখবিসুখে খেতেই যা বিচ্ছিরি, তার ওপর সুস্থ শরীরে খেতে হলেই তো গেছি। বেদানাটা হাতে নিয়ে বল্লাম—'কাকাবাবু! বেদানা দিলেন বটে, কিন্তু বলতে কি, একটু বেদনাও দিলেন।'

কাকা আমার কথাটায় কাণই দিলেন না।

'নে নে খেয়ে ফ্যাল্! খেলে গায়ে জোর হয়। ভালো শরীরে খেলেই আর জোর বাড়ে। নে, ছাড়িয়ে খা! কাকা বেদানা দিলে খেতে হয়।'

মনে মনে আমি বলি, 'কাকস্য পরিবেদনা।' এবং প্রাণপণে বেদনা দূর করি, এক একটাকে পাক্‌ড়ে গলা ধ'রে দূর ক'রে দিই —একেবারে গালের ভেতরে। তারপর আমার গলার তলায়।

'তুমি গলাধঃকরণ করো। বুঝতে পেরেচি।' আমি বলি।

'ঠিক বলেচেন! চমৎকার বলেচেন, কিন্তু'—ছেলেটি উস্‌কে উঠেই তক্ষুনি আবার নিবু নিবু হয়ে আসে, কেমন যেন মুষড়ে পড়ে। "তার পরে শুনুন্!—"

এমন সময়ে কাকীমা এসে পড়লেন। এসেই কাকার কবল থেকে আমাকে উদ্ধার কর্‌লেন।

'কী সকাল বেলায় ছেলেটাকে ধ'রে ধ'রে বেদানা খাওয়াচ্ছ? ওসব ওদের কখনো ভালো লাগে? রোচে কখনো? মণ্টু, আয় চপ্ খাওয়াব তোকে, ভালো এঁচোড়ের চপ্, আমার নিজের তৈরী, রান্নাঘরে আয়।'

পিতৃব্যস্নেহ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে হাঁপ ছেড়ে রান্নাঘরে গিয়ে উঠলাম। কাকীমা ছোট্ট একটু পিঁড়ি দিলেন বস্‌তে—'বোস্।'

'না, এই ভুঁয়েই বসি।' আমি বল্লাম—'পিঁড়ি দিয়ে কেন আর পীড়িত করছেন কাকীমা?'

'য়্যাঁ, কি বল্লি?' কাকিমা কাণ খাড়া করলেন।

'পিঁড়ী তো নয়, পীড়নের যন্ত্র।' আমার পুনরুক্তি হোলো— 'যন্ত্রণাও বল্‌তে পারেন।' আরো ভালো করে, বল্লাম আবার—'না কাকীমা, আমি প্রপীড়িত হতে চাইনে।'

কাকীমা যেন নিজের কাণকে বিশ্বাস করতে পারেন না।

'এসব আবার কেমন কথা?' কাকীমা হাঁ ক'রে রইলেন—'যন্ত্র আবার যন্ত্রনা—কীসব যা তা বক্‌চিস্ আবোল তাবোল? কাকীমার দুই চোখ বিস্ময়ে চোখা হয়ে উঠলে।

'চপ দিন্, তাহলে চুপ্ কর্‌ব' বল্লাম আমি।

কাকীমা একটু ইতস্ততঃ ক'রে চপের প্লেট্‌টা এগিয়ে দিলেন। কাম্‌ড়াতে গিয়ে দেখি দাঁত বসে না। চর্ব্ব্য-চেষ্য-লেহ্য-পেয়র বাইরে এ আবার কি জিনিষরে বাবা?

কাকীমা, এ কী বানিয়েছেন? এ কি চপ্? এর চাপ তো আমি সইতে পারছি না।' আমি জানাই—'এঁচোড়গুলো আগে কিমা ক'রে নেন্‌নি কেন কাকীমা? এ যে চোরেরও অখাদ্য হয়েছে। এই চপের আঘাত না ক'রে আমাকে চপেটাঘাত করলেও পারতেন, আমি হাসিমুখে খেতাম।'

কাকীমার চোখ কপালে উঠে যায়, বহুক্ষণ তাঁর মুখে কথা সরে না। তারপর তাঁর সমস্ত মুখ কেমন-একটা আশঙ্কার আব্‌ছায়ায় ভ'রে ওঠে। তিনি ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস্ করেন—

'ঢোক্‌বার আগে তুই এ-বাড়ীর ছাঁচ্ তলাটায় দাঁড়িয়ে ছিলি না? তুইই তো? আমি ওপর থেকে দেখলুম যেন?'

'হ্যাঁ ভাবছিলুম, আপনার নতুন দারোয়ান্ বাড়ীতে ঢুক্‌তে দেবে কিনা! আমাকে ছ্যাখেনিতো আগে।' আমি কৈফিয়ৎ দিই—'নাম লিখে পাঠাতে হবে ভেবে কাগজ পেন্‌সিল খুঁজছিলাম, কিন্তু দরকার হোলো না। সে একটু কাৎ হতেই আমি তার পেছন দিক দিয়ে সাঁৎ ক'রে গলে পড়েছি।'

'ছ্যাঁচতলাতে তুইই দাঁড়িয়েছিলি!' কাকীমার সমস্ত মুখ ফ্যাঁকাসে হয়ে আসে—'তাই তো বলি! কেন আমার এমন সর্ব্বনাশ হোল।'

কাকীমা পা টিপে টিপে পেছোতে থাকেন—'চুপ ক'রে বসে থাকো। নোড়োনা যেন। আমি আস্‌চি এক্ষুনি।'

কাকীমার এই অদ্ভুত বিহেভিয়ার আমি যতই ভাবচি ততই মনে মনে হেভিয়ার হচ্ছি। ওরকম ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাওয়ার মানে? আমিও কি একটা এঁচোড়ের চপ না কি?

একটু পরে কে যেন দরজার ফাঁক্ দিয়ে উঁকি মারে। আবার কে একজন, একটু গলা বাড়িয়েই সরে যায়। আমার কাক্‌তুত ভাইবোন সব, বুঝতে পারি। কাকার আর সব পরিবেদনা, কাকীমার অন্যান্য অনাসৃষ্টি। ইকোয়ালি অখাদ্য। এক একটি পাকা এঁচোড়ের চপ্। কেন বাপু, অমন উঁকিঝুঁকি মারামারি কেন? আমি যদি এমনই দ্রষ্টব্য, সাম্‌না সাম্‌নি এসে কি আমাকে দেখা যায় না?

ওদের সবার হাব্‌ভাব আমার ভারী খারাপ লাগে। কেমন কেমন ঠ্যাকে যেন। আশপাশ থেকে চাপা গলা কাণে আসে, চারধার থেকে ফিস্ ফিস্ গুজ্ গুজ্ শুনি, আর আমার দু'হাত নিস্ পিস্ করতে থাকে। ইচ্ছে করে, হাতের নাগাল না পাই, কসে এক ঘা—এই চপ্ ছুঁড়েই লাগাই না কেন এক একটাকে?

ভাব্‌তে ভাবতে, যেমন না দরজা ফাক্ ক'রে একটা চপ

নিক্ষেপ করেছি, ওই নেপথ্যের দিকেই—অমনি হুট্‌পাট্‌ বেধে গেছে। হুড়-মুড়্‌ দুড়্‌ দুড়্‌, হৈ হৈ, দুদ্দাড়—রৈ রৈ কাণ্ড!

"বাবারে! মারে। ধর্‌লো। গেছি রে। কী ভূত রে বাবা। খেয়ে ফেল্লে রে।" ভারী হৈ চৈ পড়ে গেল হঠাৎ।

আমি বিরক্ত হই। ভারী অসভ্য তো এরা। খেয়ে ফেল্লাম কখন? ও-চপ্‌ তো—না খেয়েই আমি ফেলেচি। এঁঠো তো নয়, তবে কেন?

অবশেষে কাকীমা এলেন। সঙ্গে সঙ্গে এলো সনাতন। সনাতন এবাড়ীর পুরাতন চাকর। সনাতন-কাল থেকে ওকে দেখেচি।

দুজনেই সসঙ্কোচে ঢুকল।

সনাতন একেবারে আমার অদূরে এসে দাঁড়াল। কিরকম চোখ পাকিয়ে কট্‌মট্‌ করে, তাকিয়ে থাকল আমার দিকে। যেন চিন্‌তেই পার্‌ছে না আমায়।

পুরাণো চাল যেমন ভাতে বাড়ে, পুরাণো চাকর তেম্‌নি চালে বাড়বে, এ আর বিচিত্র কি? তবু আমি একটু অবাক হলাম।

'কাকীমা এ্কি?' আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম।

কাকীমা কি রকম একটা সন্ত্রস্ত ভাবে দরজা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিলেন, বেশী আর এগোন্‌নি। তিনি কোনো জবাব দিলেন না। তাঁর পেছনে, চোখ বড়ো বড়ো করে, বাড়ীর যত ছেলে মেয়েরা, ঝি-চাকর যত!

সনাতন বিড়্‌ বিড়্‌ ক'রে কী সব বকে, আর সর্‌ষে ছুঁড়ে ছুঁড়ে আমায় লাগায়। আমার সারা গায়ে।

আমার ভারী বিচ্ছিরি লাগে। এবং লাগেও মন্দ না। 'সনাতন, এসব কি হচ্ছে? তোমাদের সব মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি? কী বিড়্ বিড়্ করচ? তোমার ঐ কটাক্ষ আমার একেবারেই ভালো লাগ্‌চে না।'

সনাতন তবুও বিড়্ বিড়্ করে।

'কথং বিড়্ বিড়য়সি—সনাতনং?' আমি সংস্কৃত ক'রে বলি—'সনাতন, তোমার এ বিড়ম্বনা কেন?'

'আপনি কে?' সনাতন এতক্ষণ পরে একটা কথা বলে।

"আমি—আমি তোমাদের মণ্টু। আমাকে চিন্‌তে পার্‌চ না, সনাতন?' আমি অবাক্ হয়ে যাই।

'মণ্টু না হাতী!' সনাতন বলে—'বলুন আপনি কে? আপনি কি আমাদের বেলগাছের বাবা? দয়া ক'রে এসেছেন, পায়ের ধূলো দিতে, আজ্ঞে?'

'ওসব রসিকতা রাখো। কারো বাবা-টাবা আমি নই, তা বেলগাছেরই কি আর তালগাছের কি। ওসব গেছো ছেলেদের আমি ধার ধারিনে।

'তবে কে তুমি? তুমি কি তাহলে আমাদের গোরস্থানের মাম্‌দো? সনাতন একটু সভয়েই এবার বলে।

'বল্‌চি না আমি মণ্টু? ন্যাকামী হচ্ছে নাকি? কদ্দিন কতো চকলেট্ খাইয়ে তোমায় মানুষ করলাম।' আমার রাগ হয়ে যায়।

'মণ্টু না ঘণ্টা। আমাকে আর শেখাতে হবে না। আমার

কাছে চালাকি? ভূত চরিয়ে চরিয়ে আমার জীবন গেল। হাড় ভেঙে সুর্‌কি বানিয়ে দেব। বল্, কোন্ ভূত আমাদের মণ্টুর ঘাড়ে চেপেচিস্? বল্ আগে?'

"বোধ হয় কোনো রামভূত।" আমি আর না ব'লে পারি না। আধা-গল্পের মাঝখানেই বাধা দিয়ে বলি। স্বনামধন্য আমার নিজের প্রতিই কেমন যেন একটু কটাক্ষ হয়, কিন্তু না ব'লে পারা যায় না।

"সনাতনও ঠিক ঐ কথাই বল্ল। বল্ল, 'গিন্নীমা, এ হচ্ছে কোনো রামভূত। সহজে এ ছাড়্‌বে না। রাম নামেও না। সর্‌ষে-পড়া নয়, এর অন্য ওষুধ আছে।'

এই বলে—"

ছেলেটি আরো বিস্তারিত করে—

"সনাতন কর্‌ল কি, জলভর্তি বড়ো একটা পেতলের ঘড়া এনে হাজির কর্‌ল আমার সামনে। বল্ল, 'বুঝেচি তুই কে। ঐ অ্যাশ্ শ্যাওড়ার শাঁক চুন্নী। টের পেয়েছি ঢের আগেই। তোল, তোল এই ঘড়া দাঁতে করে,।'

"ভাবুন্ দিকি, কী ব্যাপার। ঘড়া দেখেই তো আমার চোখ ছানাবড়া। আমাকে ওরা যে কী ঠাউরেছে তাও আর আমার বুঝ্‌তে বাকী নেই। ওদের কাছে আমি এখন কিম্ভূতকিমাকার। আমার প্রতি ওদের কারু যে মায়া দয়া হবে না তাও বেশ বুঝ্‌তে পেরেছি। আমার ভূত না ছাড়িয়ে ওরা ছাড়বে না।

'তবু একবার কাকীমাকে ডাকি—শেষ ডাকা ডেকে দেখি—

'কাকীমা এসব তোমাদের কি হচ্ছে? আমাকে তোমরা পেয়েছ কি? এসব কি বাড়াবাড়ি? আমার একদম্ ভালো লাগ্‌ছে না।'

কাকীমা চোখের জল মুছে চুপ ক'রে থাকেন।

তখন সনাতনকে নিয়েই শেষ চেষ্টা করতে হয়। তাকেই বলি—'বাপু, তোমার এই সনাতন-পদ্ধতি অতিশয় খারাপ। কী চাও বলো তো? চকোলেট্ না চারটে পয়সা? তাই দেবো, ছেড়ে দাও আমায়।'

'শাঁকুচুন্নী ঠাক্‌রুণ, আর নাকে কান্না কেঁদনি। ভালো চান্ তো যা বলি, তাই করুন দিকি এখন।' এই ব'লে সনাতন ঘড়াটাকে মন্ত্র পড়ায়।

'আমার মাথা ঘুরে যায়। জলভরা ঐ বড় ঘড়া—এক মনের কম হবে না। দু'হাতেই কোনোদিন তুলতে পারিনি. আর তাই কিনা, মুষ্টিমেয় এই কটা দাঁতে আমায় তুলতে হবে?

জাতও গেল, দাঁতও গেল, প্রাণও যায় যায়।

ধমক্ লাগায় সনাতন—'ভালো চাস্ তো ন্যাকাপনা রাখ্। তোল্ দাঁতে করে। নইলে দেখছিস্—'

বল্‌তে না বল্‌তে সনাতন—"

ছেলেটি থেমে যায়। মুখ চোখ তার লাল হয়ে ওঠে। চক্‌চকে চোখ ছল্‌ছল্ করতে থাকে।

আমার বন্ধুটি উৎসাহ দেয়—"বলো বলো—জমছে বেশ।" আমি কিছু বল্‌তে পারি না। মুখ কাঁচুমাচু ক'রে বসে থাকি।

সব দায়, সমস্ত অপরাধ যেন আমার—আমারই কেবল। এই কেবলি আমার মনে হতে থাকে।

"বল্‌তে না বল্‌তে সনাতন ঘা কতক আমাকে লাগিয়ে গ্রায়। এই সনাতন, যাকে আমি কতো চকোলেট্ খাইয়েছি, ছোটবেলায় কতো না ওর পিঠে চেপেছি, কতই না ওকে পিঠেছি, আর সেই কিনা……।"

ছেলেটির কণ্ঠ রুদ্ধ হয়। আমার এক চোখ দিয়ে জল গড়ায়। আমার বন্ধু রুমালে নাক মোছেন।

"জগতের এই নিয়ম।" বর্ষণমুখর চোখটা মুছে ফেলে আমি দার্শনিক হবার চেষ্টা করি। "তুমি কেঁদ না,কেঁদনা তোমরা—সনাতন রীতিই এই। আজ তুমি যার পিঠে চাপছ, কাল সেই তোমার পৃষ্ঠপোষক। উপায় কি?" এই বলে আমার যথাসাধ্য ওদের সান্ত্বনা দিই।

ছেলেটি ম্লান একটুখানি হেসে আবার সুরু করে—

"বেশ বোঝা যায়, সনাতন আমার হাতে যত না মার খেয়েছে এর আগে, এখন বাগে পেয়ে সে সবের শোধ তুলে নিচ্ছে। এই সুযোগে এক ছুতো ক'রে বেশ এক্ চোট্ হাতের সুখ ক'রে নিচ্ছে। সুদে আসলে পুষিয়ে নিচ্ছে, বেশ বুঝ্‌তে পারি।

কি করি? কাঁহাতক মার খাবো? প্রাণের দায়ে ঘড়াকে মুখে তুলতে যাই। কিন্তু পারব কেন? একটু আগে আমি যে চপেই দাঁত বসাতে পারিনি—কিন্তু সে তো এর চেয়ে ঢের নরম ছিল। আর এর চেয়ে হাল্‌কা তো বটেই।

সনাতন কিন্তু ঘড়ার চেয়েও কড়া। সে ধাঁ ক'রে তার ওপরেই—"

ছেলেটি আর বল্‌তে পারে না।

"বল্‌তে হবে না। আবার ঘা কতক্‌! বুঝ্‌তে পেরেচি।" আমার বন্ধুটি ভগ্নকণ্ঠে বলেন। এবং রুমালে নিজের চোখ মুছতে ভুল করে, তাঁর পাশের আরেক জনের মুখ মুছিয়ে ছ্যান।

আমার অপর চোখটি দিয়ে এবার জল গড়াতে থাকে।

"তখন আমার মাথায় বুদ্ধি খেলে যায়! এই ধাক্কায় মূর্চ্ছিত হয়ে গেলে কেমন হয়? তাহলে হয়তো এ-যাত্রা বেঁচে যেতেও পারি। রোজার হাত থেকে ডাক্তারের খর্পরে পড়্‌ব, হয়তো ইন্‌জেক্‌সন্‌ই লাগাবে, তেঁতো ওষুধ গেলাবে, কিন্তু সেও ঢের ভালো এর চেয়ে।

বাস, অম্‌নি আমি পতন ও মূর্চ্ছা—একেবারে নট্‌ নড়ন্‌ চড়ন্‌, নট্‌ কিছু!"

এই ব'লে এতক্ষণ পরে ছেলেটি একটু হাসল, এবার আত্ম-প্রসাদের হাসি।

"মূর্চ্ছার মধ্যেই আমি শুন্‌তে থাকি, চোখ বুজেই শুনতে পাই সনাতন বল্‌ছে— 'গিন্নীমা, আমার মনে হয় ভূত নয়। ভূত হলে আলবৎ দাঁতে ক'রে তুল্‌ত। এর চেয়ে ভারী ভারী ঘড়া অক্লেশে তুলে ফ্যালে। আমার নিজের চোখেই ছ্যাখা। আমার মনে হয় মন্টুবাবুর মাথা বিগড়ে গেছে! যা বড় বড় চুল, এই গরমে, তাই হবে। আপনি কাঁচিটা আমায় দিন্‌তো! চুল

গুলো কদম ছাঁট্ করে, মাথায় ঠাণ্ডা গোবর লাগালে দুএক দিনেই খোকাবাবু শুধ্‌রে উঠ্‌বেন।'

এই কথা যেই না আমার কানে যাওয়া, আমি তো আর আমাতে নেই। য়্যাঁ, আমার এমন সাধের এক চোখ ঢাকা-চুল— শিব্রাম চকর্‌বরতির দেখাদেখি কত করে, বাড়িয়েছি—"

আমি বাধা দিয়ে বলি—"তবে যে তুমি বল্লে, শিব্রাম চকর্‌-বরতিকে কখনো ছাখোনি ?"

ঠিক স্বচক্ষে দেখিনি। তবে আজকাল ওঁর যতো বইয়ে ওঁর চেহারার যে সব কার্টুন বেরয় তাই দেখেই আন্দাজ করে, রেখে-ছিলাম। আপনি তো মশাই প্রায় তাঁর মত করেই চুল রেখেছেন দেখা যাচ্ছে !" আমার প্রতি কটাক্ষ ক'রে দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ে ছেলেটি। কত কষ্ট ক'রে কত বকুনি সয়ে, কত সমাদরে বাড়ানো এই চুল, তাই যদি গেল, তাহলে আর আমার থাক্‌লো কি !"

"সনাতনের গিন্নীমা কাঁচি আন্‌তে গেছেন, আর আমি এদিকে চোখ টিপে টিপে চেয়ে দেখ্‌লাম, সনাতন ঘড়াটা সরাচ্ছে, সেই স্থযোগে আমি না, একলাফে তিড়িং ক'রে না উঠে, চৌকাঠ পেরিয়ে, কাকৃতুত রাক্কোসদের এক ধাক্কায় কক্ষচ্যুত না ক'রে সিঁড়ি ডিঙিয়ে এক্কেবারে সেই সদরে—।

দারোয়ান্‌ হতভাগা, দ্বারে যার ওয়ান্‌ হয়ে সব সময়ে খাড়া থাক্‌বার কথা, সে-ব্যাটা তখন জিরো হয়ে পড়েছিল। ইংরিজি ওয়ান্‌-এর বদলে, বাংলা ১ ব'নে গিয়ে পা গুটিয়ে,দেয়ালে ঠেস দিয়ে জিরোচ্ছিল, আমি না সেই ফাঁকে—

'ধর্ ধর্ ধর্ ধর্ ধর্!' সোর্‌গোল উঠ্‌ল চারদিকে।

আর ধর্! এই ধুরন্ধর তৎক্ষণে—"ছেলেটি থেমে গেল। গল্পটাকে সুচারুরূপে শেষ করার জন্য, কপাল কুঁচ্‌কে যুৎসই একটা কথা খুঁজ্‌তে লাগ্‌ল মনে হয়।

"পালিয়ে এসেচ। বুঝ্‌তে পেরেচি, আর বল্‌তে হবে না। আমার বন্ধুটিই পালা শেষ করেন। "পালানো হচ্ছে একটা লম্বা ড্যাশ্‌—ওর কোথায় ফুল্‌ষ্টপ্‌ নেই।"

"তোমার নামটি কি?" আমি জিগ্যেস্ করি। "মন্টু তো বলেছ। কিন্তু ভালো নামটি কি তোমার?"

"ধ্রুবেশ।"

"বাঃ, বেশ!—"বল্‌ত গিয়ে আমার বলা হয় না। গলায় আটকায়!